প্রিয়জনোচিত

সত্যেন্দ্র আচার্য

ত্রয়ী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭১

'ত্রয়ী'র পক্ষে শ্রীমতী অণিমা দে কর্তৃক ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীদিলীপকুমার দে কর্তৃক দে প্রিণ্টার্স, ১৫৭ বি, মসজিদ বাড়ি স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

ত্রয়ী
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড
(দ্বিতল) কলকাতা-৯

নিখিলচন্দ্র সরকার

স্বজনেষু

কাণ্ডারী

বড় নির্জীব, ঠিক সাপের খোলসের মত এই অঞ্চলটা গেরুয়ার রঙ গায়ে মেখে চুপচাপ পড়ে আছে। রাঙামাটির বুকের ওপর ছোট্ট ছোট্ট টিলা। টিলার ওপর বন-ঝোপ, সবুজ। কিন্তু হাওয়ায় গেরুয়া ধুলোর পুরু আস্তরণে সবুজ গাছ নক্ষত্রের রঙ নেয়। কিছু বাড়ি চোখে পড়ে। খোলা খাপরির। মাটির দেওয়ালে নানা নকশা আঁকা এবং এসব ছাড়ালে ডুলং নদী। নদীটা যুদ্ধ শেষের ছাউনির মত। শুধু অস্তিত্বে বেঁচে আছে। মেয়েপুরুষ কোমরের কাছাকাছি কাপড় গুটিয়ে হেঁটেই পারাপার হয় বর্ষাতেও।

নদীর নামে ছোট্ট একটা ইস্টিশান আছে প্রায় চোখ বুজেই। দূরপাল্লার ট্রেন রাঙাধুলো উড়িয়ে চোখ বুজিয়ে চলে যায়। নিতান্ত তাচ্ছিল্যে দিনে রাতে দুবার থামে প্যাসেঞ্জার। এই প্যাসেঞ্জারেই নেমেছিল লোকটা।

সোজা হেঁটে সামনে একটা বাড়ি পেয়ে দাঁড়াল লোকটা। দেখল বাড়িটা। লালমাটির আলপনা দেওয়ালে। দরজার মুখেই বনমহিষের সিং ঝোলান। লোকটা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। কাকে চাস বাবুজী ?

লোকটা অবাক চোখে চোখ তুলে তাকাল। ভরযৌবনের দেহাতী মেয়েটা চোখ না নামিয়ে নিচু গলায় বলল, রাজবাড়ি ? লোকটার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আঙুল তুলল মেয়েটা। তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে ইশারায় পথ দেখিয়ে বলল, অইদিকে।

লোকটা তবু হাঁটল না। মেয়েটিকে দেখছিল, অবাক চোখে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'মেলায় যাবি না ? একটু হেসে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল মেয়েটা। যাব না কেনে, মেলা যাব, ফুল দিব মাথায়, রাজবাড়ি যাব, মাগন না আমাদের ?'

ঠিক ভাদু উৎসব এটা নয় কিন্তু ভাদুর আচরণ আর লক্ষণ নিয়ে এই মাগন উৎসবটা চলে আসছে। তখন ভিন গাঁয়ের লোক নামে এই ইস্টিশানে। মেয়ে মরদ লটবহর সঙ্গে নিয়ে। ডুলং-এর বাজবাড়ি সেদিন সাজে। ফুলের সমারোহ। আলোর রোশনাই। খানাপিনা আর মাইফেল। এই গান-বাজনার জমাট আসর শেষ হলে শুরু হয় ফুল খেলা। কিছু যুবক-যুবতী ফুল ছুড়ে ছুড়ে রাজার সামনে অন্তঃপুরে খেলা করে। রাজার একান্ত অনুগতরা রাজাকে তারিফ করে। নেশার পাত্র হাতে তুলে নেয় অনুগতরা। খেলা শেষ হলে দেওয়ানজী হাঁক দেন, বিল্লী, বাওয়া, নয়না—

যাদের ডাক পড়ল তারা ভাগ্যবতী। দেওয়ানজী হাঁকে, অন্যরা চলে যাও। রুক্ষ গলায় তারপর বলে, বিদায় নিস দারোয়ানজীর হাত থেকে। এক লোটা, এক রুপিয়া। যা—

এত গর্বের ভেতর তবু চোখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে বিল্লী, বাওয়া, নয়না। রাজার একান্ত অনুগতদের দিকে তাকিয়ে কস্তুরীর জলে ভেজানো পান তুলে মুখে পুরে দেন দেওয়ানজী। চিবোতে চিবোতে উচ্চারণ করেন, যা, বাবুদের ঘরে যা। সুপুরির একটা অংশ কট্যাং করে শব্দ তুলে ভেঙে ফেলে দাঁতের ওপর। বলে, সারা রাত্তির সেবা দিবি, না চাইলে যেচে দিবি, মাঝের পায়ের কাদা নিবি, যা।

আলোর ভেতর দাঁড়িয়ে কালো কালো দাঁতে শব্দ না তুলে হাসে ওরা। নয়নাও হাসে। সেই সকালের দেখা লোকটার দিকে চোখ তুলে তাকায়। তাকিয়ে বলে, 'ধরম লিবি, শরম লিবি আর লিবি কি, মাগান বিবি সঙ্গে আছে, রাজার আছে কি?'

রাজা তখন বেহুঁশ। সত্যিই রাজার আজ কিছুই নেই। নিতান্ত উৎসব, তাই আসে, নইলে কলকাতায়। যুবরাজ এখনো যুবক নয়। আসেও না। যারা আছেন, চোখের ওপর ঘোরাফেরা করেন, তারা আজ রক্তের কেউ নয়। শুধু অই লোকটা ছাড়া।

লোকটা রাজাকে কতদিন বলেছে, এই উৎসবের কোন মানে নেই রাজা। তুলে দিলে হয় না?

রক্তে, আভিজাত্যে বাধে রাজার। বলে, পূর্বপুরুষের রক্ত আমার গায়ে, মাগন প্রথা তোলা কি যায়?

যায়।

না। রাজা গর্জায়। দম্ভভরে পায়চারি করেন মেঝের ওপর। বলেন, 'প্রথাকে বাতিল করে দেব, এত বড় স্পর্ধা আমার নেই। তুমি কাফের।'

লোকটা হাসে। তবুও একান্ত অনিচ্ছায় এই প্রথম এসেছিল উৎসবে। সকালের প্যাসেঞ্জারে নেমেছিল, গা-গতর ক্লান্ত। সূর্য সবে উঠছিল। স্টেশনের অনেক আগে থেকেই সবুজের সমারোহ শেষ। প্রান্তর ধূ ধূ। মাঝে মাঝে ছোট্ট ছোট্ট ওই বনঝোপ। রুক্ষ মাটির বুকে অনেক সন্তর্পণে যেন দাঁড়িয়ে হাওয়া দিচ্ছিল। লোকটা ট্রেন থেকে নেমে হকচকিয়ে চারিদিক দেখছিল। হাওয়ায় এখনো শীতের রেশ স্পষ্ট নয়। পাখির ডাক কানে এল না। উড়ন্ত পাখির ঝাঁক চোখে পড়ল না লোকটার। কিন্তু সামনেই ওই বাড়িটা পেয়ে গেল। মরা মরা হাড্ডিসার দুটো গরুর গাড়ি যাচ্ছিল। লোকটা বুঝল মেলায় যাচ্ছে। তবু থমকাল লোকটা। দাঁড়াল। আর দাঁড়াতেই চোখাচোখি। মেয়েটা বলেছিল, রাজবাড়ি?

সে। এখন লোকটা চোখ নামিয়ে নিতে আবার হাসল মেয়েটা। চ।

বিল্লী কিন্তু বেঁকে বসে। উঁহু। তবু হাত ধরে টানে তবলচি। চ—

ক্যানে? হাসিতে গড়িয়ে পড়ে বিল্লী। ধরম দিব, শরম দিব। দাম বাড়ায়।

দেওয়ানজী গর্জায়। বিল্লী উত্তুঙ্গ বুকের ওপর লাল পাড় শাড়ি আরো শক্ত করে জড়ায়। পিঠের দিকে ঝুঁকে পড়া ঝুলন্ত আঁচলটা কোমরের সঙ্গে জড়িয়ে জোর করে বাঁধে। তারপর বলে, আচ্ছা, চ—

লোকটাও পিছু পিছু এল নয়নার। একটা ঘরে এসে বলল, 'তুই

নতুন গো বাবু। আমি কিন্তু পুরনো এ বাড়িতে।' তারপর হাসল ভঙ্গি করে। হেসে বলল, 'বাড়ি আমার কাছে পুরনো হলে হবে কি, আমি কিন্তু আনকোরা।'

তবু লোকটা কথা বলছিল না। সারাদিন ঘুরেছে বাড়িটা। অঞ্চলটা। মেলা দেখেছে। রাজপ্রাসাদ। সারা সন্ধ্যা নদীর চরে বসেছিল লোকটা। বসে বসে দেখেছে সন্ধ্যা নামল। অস্পষ্ট হল আকাশ। রাঙা ধুলোর চত্বর অন্ধকারে একাকার হয়ে গেল। মেলা ভাঙলো। উড়ো পাখির ঝাঁক, নদীর বাঁক পার হয়ে, রাজপ্রাসাদ পার হয়ে উড়ে কোথায় চলে গেল। একটা বাচ্চাগোছের ছেলে মেলা থেকে খেলনা কিনেছে। তালপাতার বাঁশী। বাজাতে বাজাতে আগে আগে হাঁটছিল আর পিছু পিছু একটা বুড়োগোছের প্রচণ্ড কালো লোক, একটা ছাগলের গলার দড়ি ধরে নদীতে টেনে টেনে পার করল। করে ওপারে অন্ধকারে মিশে গেল। ঘরে চলে গেল।

নয়না বলল, 'কি ভাবিস?' খাটিয়ার এক কোণে বসে পড়ে বলল, 'বসে নে ত নে। মাঝ আকাশে তারা ঢলে পড়লে আমি কিন্তু ঘুমোবো।'

লোকটা কোন আগ্রহ না দেখিয়ে তেমনি চিৎ হয়ে শুয়ে থেকেই বলল, 'নয়না, এ বাড়িতে আর কে আছে রে।'

বাব্বা! নয়না জিবের ওপর শব্দ তুলল একটা। সব কিছু তোকে জানতে হবে। তারপর পা নাচাতে নাচাতে বলল, 'তুই কেমনধারা মরদ গো?' নয়না এবার পায়ে হাত রেখে বলল, 'আচ্ছা, কামে কাটে না তোরে?' তারপর হাসিতে ঢলে পড়ে হেঁট হয়ে বুকটা ছোঁয়াল পায়ে। তবে আমি ঘুমোই।

নয়না খাটিয়া থেকে নেমে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে কাপড়টা খুলে ফেলল। ছোট্ট সায়াটা কোমর কামড়ে ধরে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত ঝুলছে। পা দিয়ে অন্ধকারেই মেঝের ওপর বিছিয়ে নিল কাপড়টা। কুঁকড়ে ধনুক হয়ে শুয়ে আঙুলের সাঁড়াশি দিয়ে বারবার পা পর্যন্ত কাপড়টা টানবার চেষ্টা করল নয়না।

নয়না। লোকটা এবার ডাকল, নয়না মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল।

নয়না উঠল না। বলল, 'কি বলিস।'

পাপ বুঝিস, পাপ?

নারে। নয়না জবাব দিল। বুঝিনে।

পুণ্য?

পুণ্যি? নয়না এবার আড় হয়ে শুয়ে উত্তর দিল, বুঝি না ক্যানে?

লোকটা আর কিছু বলল না। এক সময় অনুভব করল, নয়না ঘুমিয়ে পড়েছে। অন্ধকারে বুকের ওঠানামা লক্ষ করা যায় না, কিন্তু অনুভবে বুঝল নয়না জেগে নেই। সমস্ত রাজবাড়িটা এখন নিঝুম। উৎসবের আমেজ বুকে নিয়ে গোটা বাড়িটা নিঝুম হয়ে আছে, পাথর হয়ে গেছে।

বাইরে এল লোকটা। ওপরে অজস্র নক্ষত্র। শুকতারাটা আরো বড় বলে মনে হল চোখের ওপর। প্রেতের মত এ-ঘর থেকে ও-ঘর ঘুরে বেড়ালো লোকটা। শেষ রাতের এই হাওয়ায় শীত। শিশির জমেছে রুক্ষ মাঠে। মাটি ভিজেছে। দূরে কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু রাজার ঘরে ঝাড় লণ্ঠন জেগে আছে।

বেশ বেলা করেই ঘুম ভাঙলো নয়নার। আলো এসেছিল ঘরে। হাই তুলল। পাশ ফিরল। ফিরেই চোখে পড়ল খাটিয়াটা। লোকটা নেই।

আস্তে আস্তে প্রাণের সাড়া অনুভব করল নয়না ঘুমন্ত এই প্রেত-পুরীতে। অবাক চোখে হকচকিয়ে তাকাল চারিদিকে। তারপর শাড়িটা পরে নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। এ বাড়ির প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়নার চেনা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকাল। কয়েদখানা। আজ জীর্ণ দরজা হাঁ হয়ে আছে। উত্তরে চিড়িয়াখানা ছিল আগে। এখানে দাঁড়িয়ে জন্তুদের নিঃশ্বাস এবং গর্জন অনুভব করতেন পূর্বপুরুষরা। আজ কিছু নেই। হাতীর দাঁতের কাজ করা একটা সিন্দুক আছে সামনের ঘরে। শুনেছিল, মণি-মানিক, ধনদৌলত অনেক কিছু থাকত আগে। এখন কি আছে কেউ জানে না। কেউ খোলেও না।

নয়না কয়েক সিঁড়ি নেমে আবার দাঁড়াল। তারপর একেবারে উঠোনে নেমে এল। না, কোথাও নেই লোকটা। বাঁদিকে ঘুরে নয়না এসে দাঁড়াল মন্দিরের চাতালে। না, বন্ধ দরজা।

চাতালে বসল নয়না। রাজবাড়ির সামনে ওই ভগ্ন নহবতখানা থেকে একটু দূরে বিস্তৃত খোয়াই। খোয়াই যেখানে শেষ, সেই শেষ চিহ্নের ওপর পাহাড়ের রেখা। পাহাড় নয়। টিলা। লোকটা রাত্তিরে ওই দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আচ্ছা, এই ফুলখেলা উঠে গেলে তোমরা খুশী হও না ?

না। অতশত বোঝেনি নয়না। উত্তর দিয়েছিল।

কেন ? লোকটা বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার প্রশ্ন করেছিল।

অতশত না বুঝেই নয়না উত্তর দিয়েছিল, তোর সহ্য হয় না ?

না।

না ক্যানে ? নয়নার ঘুম পাচ্ছিল। ঘন ঘন হাই তুলছিল। মশা তাড়াচ্ছিল অন্ধকারে চাপড় মেরে মেরে।

ওমনি করে বেঁচে আছিস বলে ?

বলে কি লোকটা ? নয়না প্রথমে হাসতে গিয়ে থেমে গিয়েছিল। তারপর কি একটু ভেবে নিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ে বলেছিল, জিন্দারে জিন্দা। লোকটার হাতটা টেনে নিয়ে বুকের ওপর ছুঁইয়ে বলেছিল, ছাখ না বেঁচে নেই ? কলজের ভেতর পরানটা তোর সঙ্গে বসবার জন্যে হাহুতাশ করছে না ?

লোকটা হাত সরিয়ে নিয়েছিল। নয়না দম্ভভরে খাটিয়ার ওপর থেকে উঠে এসে মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে সায়াটা খুলে ফেলেছিল। শুয়ে পড়ে বলেছিল, তবে আমার ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোই।

নয়না এই মন্দিরের চাতালের ওপর এখন বেশ আরাম করে বসল। বসে বসে ভাবল এই নিয়ম, এই প্রথা। কবে এ নিয়ম চালু হয়েছিল, নয়না অতশত বোঝে না। জানে না। শুধু রূপকথার গল্পের মত জানে সে, দশ পুরুষ আগে রাজার মেয়ে অকালে মারা

গেলে তাকে স্মরণ করেই এই উৎসব। নয়নার মা-ও নয়নার মত কাঁচা ছিল একদিন। নয়নার মত ফুল খেলত। উৎসবে সাজাত বাড়ি। ঘরদোর নিকোত। আলপনা দিত নতুন করে মাটির দেওয়ালে। সাজত রাজবাড়ি। নহবতখানায় সানাইয়ের সুর বাজতো উৎসবের অনেক আগে থেকে। তিন দিন আগে থেকে মহলা দিত তখন রমণীরা। বারটি মেয়ে ছ'জোড়া পুরুষ-রমণীতে বিভক্ত হয়ে নকল খেলা খেলত। ফুল ছুড়ে মারত। অভিনয়ের পুরুষ মেয়েরা প্রকাশ্যে চুম্বন করত। খেলতে খেলতে এক সময় হাত ধরে বিবস্ত্র করে দিত।

একদিন ফুল খেলার শেষে এক মরদ দেওয়ানজী নয়নার মাকে বলেছিল, চল চলে যাই।

কোথায় ?

রাজার এই পুরী থেকে দূরে। অন্য কোথাও।

নয়নার মা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল।

কোথায় ? দেওয়ানজী কমলির কথাটাকে উচ্চারণ করেছিল। করে বলেছিল, অনেক দূরে। ওই পাহাড় পেরিয়ে। দু'জনে থাকব। ঘর বাঁধব।

কেন এখানে ?

কঠোর হয় দেওয়ানজী। আমার চোখের ওপর তুই ফুল খেলবি আমি দেখব ?

ছিঃ ছিঃ বলিস না। দেওয়ানজীর মুখে কমলি হাত চাপা দিয়েছিল। উৎসব না আমাদের ? মাগন ঠাকরুণ সগ্গে বসে রাগ করবে।—এ গল্প কমলি বৃদ্ধ বয়সে কতবার শুনিয়েছে নয়নাকে।

এসব ভাবনার ভেতর নয়নার এখন মনে হল লোকটা তবে গেল কোথায় ? নয়না পড়শীদের জিজ্ঞেস করলে কেউ বলল, এই ত ছিল। কেউ বলল, নহবত ঘরে একটু আগেও বাঁশী শুনছিল। দূরের খোয়াই-এ কারো ছায়া নেই। না, পাহাড়ের দিকে কেউ হেঁটে যাচ্ছে না। তবে গেল কোথায় ? নয়না শুধু এই একটা প্রশ্ন নিয়েই ঘরবার করল।

অথচ লোকটা একদিন এল। এই রাজবাড়ি দেখতে। এই রাজবাড়ির বয়েস তখন আরো পঁচিশ বছর বেড়ে গেছে। উৎসব বেঁচে আছে। প্রথাও বেঁচে আছে। লোকটা নিজের বয়েস হিসেব করে দেখল, এখন সে পঞ্চাশের কাছাকাছি। রাজা মারা গেছে। যুবরাজ ফুল খেলে এখন। নিজেই অবাক হল, প্রায় পঁচিশ বছর আগে এ বাড়িতে একবার এসেছিল সে।

এখন লোকটার মাথায় জটা। একটা ঝোলা কাঁধে, হাতে লাঠি নেই। একটা চন্দনা পাখি কাঁধের ওপর বিনা শিকলিতে বসে। লোকটা রাজবাড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে বাড়িটা নিরীক্ষণ করল। বাড়িটা আরো জীর্ণ। আরো যেন কংকালসার। তারপর ঝোলা থেকে একটা সিঙা বার করে তিনবার ফুঁকল। যারা এই অদ্ভুত লোকটার সঙ্গে সঙ্গে আগেই এসেছিল এবং বাজাতে যারা এল, সকলে ঘিরে দাঁড়াতে লোকটা বলল, 'আমি দেবতা নই, মানুষ। আমি সন্ন্যাসী নই, রাজার আত্মীয় নই, তোদের একজন।'

এই অদ্ভুত-বেশী লোকটাকে দেখতে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল সকলে। পরনে ময়লা হাঁটু-ছুঁই ধুতি। গায়ে একটা হাত দুই চাদর। অথচ কী সুঠাম চেহারা। ঋজু গৌরকান্তি এই লোকটার পায়ে হাত দিয়ে কেউ কেউ প্রণাম করছিল। কেউ দূরে দাঁড়িয়ে ভক্তিভরে হাতজোড় করছিল।

লোকটা আপত্তি করছিল। না না, পায়ে হাত দিতে নেই। মাথা নোয়াবে কেন? লোকটা মৃদু মৃদু হাসছিল। মেরুদণ্ড সোজা রাখ।

লোকটাকে হকচকিয়ে দেখল লোকে। কথা শুনছিল আর অবাক হচ্ছিল। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ, আত্মশক্তিকে দৃঢ় কর। কুসংস্কার যম, কুপ্রবৃত্তি রাবণের গদা। তারপর এক সময় বলল, 'কাল তোদের উৎসব না? মাগন না?'

বিগ্রহের ভাঙা দেউলে বসান হল লোকটাকে। দুধ দিয়ে পা ধুইয়ে দেওয়া হল। হবিষ্যান্নের সমস্ত যোগাড় করে সিধে পাঠিয়ে দিলেন যুবতী রানী নিজে।

লোকটার মুখে কিন্তু ওই একই কথা। না না, আমি কোন দেবতা নই, মানুষ। দেবতা যা পারে না, ছ্যাখ মানুষ তা পারে। লোকটা কাঁচা চাল মুঠো মুঠো করে খেয়ে খুন্নিবৃত্তি করল। দেখছিস ত কোন অলৌকিক ক্ষমতা আমার নেই। শুধু ইচ্ছাশক্তি। আত্মশক্তি। যে শক্তিতে মানুষ অলৌকিক হয়।

মৃদু হাসতে হাসতে চন্দনা পাখিটার চোখে এক একবার তাকাচ্ছিল। ছ্যাখ আমি ব্যবসায় জানি না। যাগযজ্ঞ আমি শিখিনি। তাই ভক্ত আমার জোটেনি। আমি একা। তাই আমার কথা কেউ শোনে না। সমবেত কণ্ঠে না বললে এতবড় অট্টালিকা পার হয়ে রাজার কানে সব কথা যাবে কেন রে ?

তত লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা আসছিল সকলের। দেবতা ভাবছিল। সন্ধ্যা নামছিল। ভাঙা দেউলের বাইরে ও আশ্রয় নিল। ঝোলা গোছাল। চন্দনা পাখি রাখল। রেখে বলল, 'ছ্যাখ না, পাখিটা আমায় কত ভালবাসে ?'

লোকে দেখছিল।

কোন শিকলি আছে পায়ে ? বাঁধা আছে ?

সকলে তাকালে লোকটা বলল, উত্তর ত সোজারে, দুই আর দুই-এ চারের মতন। আমিও বাসি বলে ?

আবার মৃদু মৃদু হাসল লোকটা। হেসে বলল, 'এ বাসা ভয়ের নয়, ভক্তিরও নয়। ভালবাসার জন্য ভালবাসা। বাস না তোরা।'

অবাক চোখে শুনছিল। দেখছিল লোকটাকে।

দেখবি সব কেমন জাদু হয়ে যাচ্ছে। দেবতাকে ভালবাসি ভয় করি বলে, বুঝিস না ?

যত শুনছিল, লোকগুলো তত অবাক হচ্ছিল।

এরপর বেশ জোরে একটু কেশে নিয়ে বলল, 'তোরা প্রথাকে ভালবাসিস, রাজাকে কি ভগবানকে ভয় করিস বলে।' আবার হাসলেন মৃদু। বললেন, 'নিজেকে ভালবাস, শ্রদ্ধা কর, দেখবি

কু-সংস্কার, কু-প্রথা কোথায় সব হারিয়ে গেছে। না না, এবার তোরা আমায় ঘুমোতে দে। যা যা—'

সকাল হতেই বেরিয়ে গেল লোকটা। রাঙা ধুলোর ওপর দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে কখনো হাঁটল। কখনো দাঁড়াল। উদাস তাকাল ধূ ধূ প্রান্তরে। তারপর এক সময় ঘোড়া ঘরের সামনে এসে হকচকিয়ে গেল।

একটা দেহ শুয়ে আছে। সারা দেহ বসন্তে ভর্তি। লোকটা বুঝল গুটি বসন্ত। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে কখনো কখনো, উঠে বসতে চাইছে। সারা দেহটা টেনে টেনে একটু তুলছে, আবার নেশাগ্রস্তের মত ঢলে পড়ছে। লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে ডাকল, নয়না ?

কে ? ঘোলাটে চোখে নয়না তাকাবার চেষ্টা করল, করে বলল, 'একটু জল খাব।'

লোকটা জল আনল। জল দেবার আগে কপালে হাত রেখে বলল, 'আমি।'

প্রায় প্রৌঢ়ত্বে এসেছে নয়না। জীর্ণ দেহ। মাথার চুল কিছু পেকেছে। মুখে চোখে বয়সের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট। মাথায় হাত রেখে লোকটা বলল, 'চিনতে পার ?'

মাথা নাড়িয়ে নয়না বলল, 'না'।

কষ্ট হচ্ছে ?

নয়না চুপ। চোখ বুজে অনেকক্ষণ পড়ে থেকে বলল, 'না।'

জল খাও। লোকটা অনেক সন্তর্পণে গালে জল ঢেলে দিল। আড়ষ্ট জিব, জল গিলতে কষ্ট হচ্ছিল নয়নার। একটা চেটাই-এর ওপর নয়না শুয়ে আছে। সারা অঙ্গ গুটিতে ছেয়ে। কিছু ফেটেছে রস গড়িয়ে পড়ছে।

নিজের বসনের খানিকটা ছিঁড়ে রস মোছাল লোকটা। মাছি তাড়াল। আলতো দেহটা তুলে ধরে ছেঁড়া টেনা খানিকটা পেতে দিয়ে বলল, 'শোও। আমি আসছি।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে আবার ঘুরল লোকটা। শুকনো গাছ

গাছালির ডাল ভাঙল। কাঠ সংগ্রহ করল। শক্তিমান পুরুষের মত নিজের মাথায় করে বয়ে এনে দেহটার অনতিদূরে আগুন জ্বালাল।

নয়নার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লে লোকটা একটা দীর্ঘশ্বাস তুলল। তুলে বলল, 'ছিঃ, কেঁদ না। আগুনের তাপ স্তিমিত হয়ে গেলে শুকনো পাতা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল। একটা কাঠ সেই আগুনের ভেতর গুঁজে দিল। তুমি ভাল হয়ে যাবে।'

লোকটা দেবতা। সারা গ্রাম রটে গেল। কেউ ওই বয়েসে নিমগাছের মগ ডালে উঠতে দেখেছে বলল। কেউ বলল, মাথায় রাশীকৃত কাঠ নিয়ে নদী পার হয়ে এল, পায়ে এতটুকু জলের দাগ পর্যন্ত লাগল না। কেউ বলল, বান মেরে পোকা মারছে ঝুড়ি ঝুড়ি। শুধু আগের চেয়ে একটু সুস্থ হয়ে নয়না বলল, 'তুমি কে, আমি কিন্তু এখনো চিনতে পারিনি।'

তুমি নয়না। আমি কিন্তু চিনেছি।

তুমি দেবতা। যেন নেশার ঘোরে ওইটুকু বলে নয়না পাশ ফেরবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না।

আমি মানুষ। লোকটা আবার মাথায় হাত রাখল। তুমি ঘুমোও। নিমের কচিপাতা সারা দেহে বুলিয়ে বুলিয়ে স্বস্তির পরশ দিল। নয়না ঘুমিয়ে পড়ল।

দিন গড়িয়ে এখন বিকেল। শুকনো চাল, ফলমূল খাওয়াল চন্দনাকে। তারপর পাখিটাকে পাশে নিয়ে বসে ভাবল লোকটা—

এই সুদীর্ঘ দিন ঘরছাড়া। গোটা পঁচিশ বছর ধরে সারা ভারতবর্ষ ঘুরেছে। দেখেছে অনেক। অনেক অভিজ্ঞতা জড়ো হয়েছে এই পঞ্চাশ বছরের জীবনটাতে। দেখেছে বেগার প্রথা। খেতখামারের দায়িত্ব নিয়ে যে লোকটা অন্ন সংগ্রহ করে সংসারের, সে প্রভু সেবা করে মাসে অন্তত একদিন। প্রভু অতিথি হন রাত্তিরে। যুবতী স্ত্রী অথবা কন্যা তাকে সেবা করেন দেহ দিয়ে।

এই লোকটা রুখে দাঁড়িয়েছিল। বুঝিয়েছিল, এ পাপ, এ অন্যায়। প্রহার দিয়ে প্রভুর ভৃত্যই গ্রামছাড়া করে দিল।

দেখেছে নর্মদা ঝরণায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা। স্বর্গলাভের বাসনায়।

রুখে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। স্বর্গ নেই। এই বোধ অন্ধত্ব। এই অজ্ঞতা অক্ষম পিচুটির মত। রাতের অন্ধকারে এই বাসনার মৃত্যু তবু কমেনি।

দেখেছে সতীদাহ নিম্ন এক শ্রেণীর জাতের ভেতর। মা-এর পুণ্যকামী দেহাত যুবক সহায়-সম্বলহীন অশীতিপর বৃদ্ধাকে টাকা দিয়ে কেনে। তারপর মা-এর বেনামীতে পিতার শ্মশান চুল্লীতে এখনো বেঁধে পুড়িয়ে মারে। লোকটা রুখে দাঁড়িয়েছিল। পুড়িয়ে মারবে বলে ধরতে গিয়ে লোকটাকে খুঁজে পায়নি।

প্রথাসর্বস্ব এই সংস্কার পাপ। মুক্তি চাই। আত্মার মুক্তি। বিবেকের বিকাশ চাই। ইচ্ছাশক্তিকে প্রবলতর কর। কেউ শুনল, কেউ শুনল না। কেউ বলল, পাগল। কেউ কেউ গুন গুন করল, লোকটা দেবতা।

এই ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল কারণ লোকটা এখন দেখল নয়নার গলা দিয়ে কেমন একটা ঘড় ঘড় শব্দ উঠছে।

লোকটা তাকাল দূরে। সন্ধ্যা অনেক আগেই নেমেছিল। ঠাণ্ডা থেকে আগলহীন ঘরের ভেতর কোলে করে নিয়ে গেল অচৈতন্য নয়নাকে। ঘরের ভেতর থেকে বাইরে তাকাল লোকটা। নক্ষত্রের সঙ্গে মিশে গেছে চাঁদের আলো। দূরের মাঠ পার হয়ে টিলা। তার ওপর চাঁদের রেণুকণা ছড়িয়ে পড়েছে। রাজবাড়ি মুখর হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে: আলোর রেশ ছড়িয়ে পড়েছে। ধূপের গন্ধ, আতরের মাতাল সুবাস, মিলেমিশে একাকার। বাতাসে জড়িয়ে আছে। লোকটা ভাবল, হয়ত এ-মুহূর্তে রাজার অনুগতদের হাতে ফুল। রাজগৃহের প্রমোদ উৎসবে যুবতীরা ব্যস্ত। মাগন উৎসব আরম্ভ হবে যুবরাজ বাজুবন্ধ পরে উৎসবে এসে দাঁড়ালেই।

শুকনো চাল, জল আর কলা চিবিয়ে চিবিয়ে লোকটা রাতের আহার অনেক আগেই শেষ করেছিল। উঠে গিয়ে পাখিটাকে ঝোলার ভেতর সযত্নে শুইয়ে রেখে নয়নার পাশে এসে বসল।

দেখতে দেখতে রাতের আঁধার সব কিছু গ্রাস করে নিল। চাঁদ ডুবে গেল। নক্ষত্রের আলো আরো যেন মরে এল। লোকটা এখন বাইরে তাকিয়ে আকাশে তাকিয়ে বুঝল, মাঝরাত পার হয়ে গেছে। আগলহীন দরজার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে বুঝল, একটা ছায়া যেন এদিকে আসছে।

কে? লোকটা উঠে বসল। শেষ বাতিটা জ্বলতে জ্বলতে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। বাইরে কাঠের আগুন প্রায় নিবু নিবু। তবু যেটুকু জ্বলছিল তার অস্পষ্ট আলোয় কোন রমণীর ছায়া বলে মনে হল।

ভূত প্রেত কোনদিন বিশ্বাস করেনি লোকটা। তবু উঠে বসে নয়নাকে ছুঁল। তারপর চার দেওয়ালের ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল। ছায়া এগিয়ে আসছে।

ছায়াটা এল। সর্বাঙ্গ চাদরে মোড়া। এই প্রথম ভয় পেল লোকটা। গলা ছেড়ে চিৎকার করতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর ভাঙা গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে অস্পষ্ট উচ্চারণ করল, কে, 'কে তুমি?'

কোন উত্তর নেই।

কে? প্রায় চিৎকার করে উচ্চারণ করল লোকটা।

চাদর খুলে এবার সামনে দাঁড়াল ছায়াটা। অস্পষ্ট আলোয় যতটুকু প্রত্যক্ষ করা চলে, সেই আলোয় দেখল লোকটা, ছায়া নয়, একজন রমণী। রমণী প্রণাম করল লোকটাকে।

কে তুমি? এবারে অনেকখানি সাহস আনল গলায় লোকটা।

তবু কথা নেই। আরো কাছে সরে এল লোকটা। রমণী এবার বুঝল লোকটা তাকে দেখছে। নিরীক্ষণ করছে। শুধু বলল, 'আপনি দেবতা, তাই এলাম।'

না না, আমি মানুষ। ঠিক বিনয় নয়, যথাসম্ভব কর্কশ উচ্চারণ করল। আপাদমস্তক আবছা অন্ধকারে প্রত্যক্ষ করে বলল, 'আমি মহাপুরুষ নই, কেন বিশ্বাস করে না লোকে?'

আমি অসহায়। রমণী স্থির দাঁড়াল লোকটার সামনে। বলল,

'আপনি জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারেন আমি শুনেছি। আপনি হাত বাড়ালে গাছের ডাল নুয়ে আসে। আমাকে বাঁচান।'

বল। লোকটা এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল।

আমি রাজার বংশধর চাই। একটু থেমে মাথা নিচু করে বলল, 'রাজা অক্ষম, অথচ আমার সন্তান না হলে এই প্রথা উঠে যাবে। উৎসব উঠে যাবে। এই পাপের দায়ভাগ নিয়ে প্রজাদের কাছে কী করে আমি মাথা তুলে দাঁড়াব?'

সব নিঝুম। সমস্ত পৃথিবীটা যেন এই রাজপুরীকে কোলে নিয়ে আশ্চর্য একটা ঘুমে ঢলে আছে। এই প্রথম পাশে কোথাও কামিনী গাছে ফুল ফুটেছে বলে মনে হল লোকটার। সুন্দর গন্ধ অনুভব করে বুঝল রমণী যুবতী। পূর্ণ যৌবনবতী। রমণী এখন আরো কাছে এল। মুখাবয়ব ভাল করে চোখে পড়ছে না। তবু আশ্চর্য সুন্দরী বলে মনে হয় লোকটার।

আপনি মুখ তুলে চান ঠাকুর। চাদরের এক কোণের গিঁট খুলে রমণী এবার দেখল বাইরেটা। তারপর বলল, 'এই নিন পুষ্প, আমাকে ছুড়ে মারুন। আমাকে গ্রহণ করুন।'

লোকটা তবু কোন আগ্রহ দেখাল না।

আপনার সেবার জন্য এই রাত্তিরে এই বিরাট সমুদ্দুর পার হয়ে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।

দিনের আলোয় কামিনীর ঝোপ কি ফুল, অত চোখে পড়েনি লোকটার। এখন বুঝল ফুলে ফুলে ভর্তি গাছগুলো। এতক্ষণ কোন পাখির ডাক লক্ষ করেনি লোকটা। এখন বুঝল, এই রাতে কোন না ঘুমের পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছে। ডাকছে। আকাশে তাকাল লোকটা। জ্বল জ্বল করে তারাগুলো জ্বলছে। অস্পষ্ট আলোয় সব কিছু কেমন সুন্দর বলে মনে হল লোকটার। রমণী এবার মধুর গলায় বলল, 'উৎসবকে বাঁচান ঠাকুর। আপনি দেবতা। মাগনকে বাঁচান।'

এতক্ষণ স্থির দাঁড়িয়েছিল লোকটা। কেমন চঞ্চল হল এখন।

বার বার শরীরের দিকে তাকাল। মুখাবয়ব লক্ষ করতে চাইল। রমণী এবার স্পষ্ট গলায় বলল, 'তুমি তো দেবতা, এতটুকু করুণা নেই?'

না না, আমি মানুষ। লোকটা বাধা দিল।

তবে দয়া নেই কেন শরীরে? এবারে কঠোর হল রমণী।

লালসা, লালসা, এই প্রথম একটা কেমন লালসা অনুভব করল মানুষটা। তারপর ত্রস্ত পায়ে ভেতরে ঢুকে গেল। লজ্জায়, অভিমানে রমণী আর দাঁড়াল না।

ত্রস্ত পায়ে ভেতরে ঢুকে বাতিটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল। নয়নার মৃতদেহটা একটানে দেওয়ালের দিকে সরিয়ে দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভাঙা গলায় ডাকল, কই এস।

কেউ এল না!

রাজপুত্র, কোটালপুত্র

ট্রেনটা ভোরের টোপর মাথায় পরে থামল। আগের স্টেশন পর্যন্ত মানুষের যে ব্যস্ততা ছিল, তা এখন নেই। কারণ আমাদের মত এই ট্রেনটার যাত্রাপথ এখানেই ফুরিয়ে গেল। অতএব আরামের ঢেকুর তুলে নিশ্চিন্তে স্টেশন প্ল্যাটফরমটা পিঁপড়ে পায়ে পার হয়ে এসে সেই দীর্ঘকায় অথচ প্রবীণ লোকটিকে খুঁজে নিতে মোটেই কষ্ট হল না। কারণ অবনীবাবু বলেছিলেন, এতটুকু কষ্ট হবে না চিনতে তোমাদের। সাদা হাফপ্যান্ট, মাথায় হ্যাট, সাদা জামা আর খাকি রং-এর ফুল মোজায় হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢাকা। হাতে চুরুট আছে দেখবে। দেখলেই চিনবে, বুঝবে সে-ই রঞ্জনকাকা। প্রণাম করবে, বুঝলে?

কত দূরত্বে কলকাতা কিন্তু বাংলার শ্যামল শোভা মাঠ ভরে চোখের ওপর ছড়িয়ে আছে। শিশির পড়েছিল। শীতের হাওয়া নেই অথচ শীতালু ভাব ভুরু আর কপালের ওপর অনুভব করে হেঁট হয়ে প্রণাম করতে যাব কি, সেই সুপুরুষ প্রৌঢ় লোকটি আরো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। হাত ধরে বললেন, 'কেন, অকারণে মাথা নোয়াবে কেন, দেখ না এই বয়েসে কত আমি কঠিন। মাথা হেঁট আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। না। এস।'

এই স্টেশনের কর্তা হয়ে অবনীবাবু কাটিয়ে গেছেন দীর্ঘ পাঁচটি বছর। কথায় কথায় অবনীবাবু বলেছিলেন, 'নতুন বিয়ে করেছ, এতই যখন ঘোরার শখ তোমাদের তবে যাও না মৌভাণ্ডার। একদিন না হয় কাটিয়ে এস না। দশটায় বাস ছাড়ে ওখান থেকে হনুমানপোতা। ডাকবাংলো আছে, ভালো লাগলে একটা রাত ওখানেও না হয় থাকলে। তারপর ওখান থেকে বাস ধরে রামগড়। কিন্তু মৌভাণ্ডারে দেড়শ বছরের পুরনো ক্যাথলিক গীর্জাটা দেখতে ভুল না।'

রঞ্জনকাকার পিছু পিছু হাঁটছিলাম। আমি আর সুমিতা।

লাগেজ যা ছিল, তা রঞ্জনকাকা চাপিয়ে দিয়েছেন একটা রেলকুলির মাথায়। লোকটা বারবার পেছন ফিরে সুমিতা আর রঞ্জনকাকাকে দেখছিল। রঞ্জনকাকা ঘনঘন চুরুট থেকে ধোঁয়া টানছিলেন। বারবার গলার ভেতর চালান করে দিয়ে আবার ফিরিয়ে এনে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পরিব্যাপ্ত মাঠে চোখ বুলিয়ে বললেন, এই মৌভাণ্ডার থেকে কলকাতার দূরত্ব আর কতই বা, কিন্তু দেখলেই বুঝবে, বাংলা দেশ সব দূরত্বকে মুছে দিয়েছে। সেই শোভা, নয়নাভিরাম সেই পরিচিত দৃশ্য তাকালেই দেখবে চোখের ওপর ছড়িয়ে। সব কিছুকে বাংলা দেশটা বড় আপন করে নিতে জানে, না?

সময়টা এখন হেমন্তের মাঝামাঝি। পাতা ঝরা শুরু হয়েছে। কিছু গাছ রিক্ত। কিছু যেন নতুন পাতায় সাজার জন্য ব্যস্ত। রোদ উঠছিল। মাঠে, লাল ধুলোয় ছড়িয়ে পড়ছিল। কিছু গাছের রিক্ত-পত্র শাখা ভিজিয়ে দিয়েছিল।

অবশেষে আমরা গন্তব্যে পৌঁছলাম। প্রবাসে যে সব বাঙালী অবসর বিনোদনের জন্য অথবা স্বাস্থ্যচর্চার জন্য বাংলো টাইপের যে সব বাড়ি তৈরি করেছিলেন তার যেন নিজস্ব একটা প্যাটার্ন আছে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নেই। সেই প্রশস্ত আঙিনা। যা পার হয়ে পশ্চিম-দুয়ারী ঘর। আঙিনায় তিনটে সারি সারি ইউক্যালিপ্‌টাস। বৃত্তাকারে ঘিরে আছে কাঁধ-ছুঁই পাঁচিল যার নিকট-প্রতিবেশী মনোরম কিছু কামিনী। যুঁই। আর পাহাড়িয়া কিছু লতানে গাছ। যার ফুলে গন্ধ নেই কিন্তু শোভা আছে। মধু নেই কিন্তু লোভী মৌমাছি ঘুরে বেড়ায়। মাতাল জ্যোৎস্নায় চোখের ওপর বড় লাবণ্য ছড়িয়ে দেয়। কাঠের গেট সামনে। গেটের বাঁদিকে আউট হাউস। ওখানে আমাদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে যা ব্যতিক্রম তা হল, পাহাড়ী ঢলে তৈরি নদীটার জলধারা বাড়িটার পশ্চিম দিগন্ত ছুঁয়ে চলে এসেছে পাঁচিলের ভেতর। এসে বন্দী হয়ে আছে। সম্ভবত ভীষণ রসিক ছিলেন গৃহস্বামী। অথবা রুচি বা বোধের ভেতর

আভিজাত্যের স্পর্শ ছিল। তাই এমন কারুকাজে ভরিয়েছিলেন গৃহাঙ্গন। সে জলে ঢেউ নেই। অচঞ্চল বন্দী জলধারার ওপর একটা ছোট্ট নৌকো ভাসছিল। সেই নৌকার ওপর নির্বিকার দ্বিতীয় পুরুষ বসে আছেন।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে নদীটার উৎসমুখ লবকুশ পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে পরে ব্যাখ্যা করেছিলেন রঞ্জনকাকা। যে বন্দী জলধারাটুকু আমাদের এক্তিয়ারে সেটুকুর নাম 'নীলাবরণ'। নামটা অবশ্য প্রসন্নর দেওয়া। আসলে নদীটার নাম সীতানালা। সীতার সেই চোখের উদ্দাম জলধারা যখন পাহাড়ী ঢলে পূর্ণ যৌবনবতী সাজে, কূলপ্লাবী হয়, তখন বুঝতে পারি বর্ষা এসেছে। নইলে সব ঋতুই আমার চোখে সমান। প্রকৃতি সব সময় আমার চোখে চাতুরী ছড়িয়ে দেয়। বুঝি না কে বসন্ত, কে হেমন্ত নিয়ে এল মৌভাণ্ডারে।

আঙিনা পার হয়ে ইউক্যালিপটাসের ছায়া মাড়িয়ে নীলাবরণ-এর সামনে এসে থামলেন। "এই হল প্রসন্ন" বলে আঙুল তুলে নৌকোর ওপর লোকটিকে দেখালেন। আমার পরম বন্ধু। তোমাদেরও প্রসন্নকাকা।

সম্ভবত নৌকোটা বাঁধা থাকে একটা অল্পবয়সী তমালের ডালে। গাছের সঙ্গে বাঁধা দড়িটার একদিক ধরে টেনে টেনে নৌকোটা কূলে আনলেন। সহাস্য মুখ। বয়সে প্রবীণ। অস্থিচর্মসার দেহ। যেন যুদ্ধশেষে সৈন্যদলের পরিত্যক্ত ছাউনির মত। তবু সুবেশ চেহারা। ধোপদুরস্ত পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে আছেন প্রসন্নকাকা।

ওই যে নৌকোটা দেখছ, রঞ্জনকাকা তাকালেন, কতদিন ভেবেছি, ওটা ডুবিয়ে দেব। কিন্তু ভয় করে। বড় নিঃসঙ্গ হয়ে যাব তাহলে দুজনে। স্মিত হাসলেন রঞ্জনকাকা। বললেন, 'কিন্তু ভয় তারও চেয়ে প্রসন্নকে। এক এক সময় ওর চোখ দেখে মনে হয়, আমার চেয়েও একলা। তাই ভয় করে।'

বড় আকুল চোখে তাকালেন রঞ্জনকাকা। নৌকোর তীর্যক ছায়া

জলের ওপর লক্ষ করলেন। এই বাড়ি, এই পরিবেশ, জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ক্রমশ কিছু মধুর স্মৃতি যেন রোমন্থন করলেন, করে বললেন, স্মৃতিই যত কঠোর, যত বিড়ম্বনা। রিক্ত, নিঃস্ব দুটো মানুষকে হাত ধরে মৃত্যুর দিকে পরম যত্নে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বয়সের তল্পী মাথায় করে তীর্থে ত এসে গেলাম। কিন্তু প্রসন্ন?

প্রসন্নকাকা এগিয়ে এলেন। হাসিখুশী চোখ। আয়ত। দীর্ঘ ভুরু। কানের পাশে শুভ্র কেশ অকৃপণ জ্যোৎস্নার মত ছড়িয়ে আছে। শব্দ না করে হাসলেন। এস এস, আবেগে আমার হাত স্পর্শ করে বললেন, বোধহয় নামেই মৌভাণ্ডার। মধু বোধহয় নেই। থাকলে তোমাদের মত মৌমাছিরা ভুলেও এদিকে আসে না কেন? এবার শব্দ করে বড় সুন্দর হাসলেন প্রসন্নকাকা। কতকাল পরে যে একজোড়া বাঙালীর মুখ দেখলাম। এস, এস।

আমরা চারজনে আউট হাউসে এলাম। ছোট ছোট দু'খানি ঘর। ফালতু কিছু জায়গা দু' ঘরের পাশে। অবিশ্যি ওখানে, ওই চাতালের ওপর দাঁড়ালে পশ্চিমের বিস্তৃত খোয়াই চোখে পড়ে। দূরে লবকুশ পাহাড়ের স্মৃতি। ধোঁয়ার মত। খুব দূরে। তাই অস্পষ্ট। জ্যোৎস্নায় নাকি আরো স্পষ্ট হয় রাত্তিরে। প্রসন্নকাকা বললেন, এস এস বসো। রাত্তিরে দেখো, লবকুশ কত স্পষ্ট দেখবে তখন।

ঘরের ভেতর দুদিকে দুটো চৌকি। খান দুই চেয়ার। একটা জলের কুঁজো। ঠিক যেমনটি হাসপাতালে দেখা যায়। প্রসন্নকাকা বললেন, খুব একটা কষ্ট হবে না তোমাদের। অবনীবাবু বদলী পর্যন্ত দীর্ঘ পাঁচ বছর এখানে থেকে গেছেন। তাছাড়া শ্যামলী ত আছেই।

ভরাট গড়নের ঠিক সাঁওতাল নয়, অথচ বাঙালীও নয় এমন একটা যৌবনবতী মহিলা ঘরে ঢুকল। হাতে চা আর ডিমের হালুয়া। নামিয়ে রাখল সামনে। প্রসন্নকাকা বললেন, এই হল শ্যামলী। আসলে কিন্তু সাঁওতালী। রঞ্জনকাকা বললেন, আসলে প্রসন্ন কবি

ত, তাই সাঁওতালীকে ছোট করে একটু রং চং লাগিয়ে শিল্পীত করে করেছে—শ্যামলী।

চা-এর পেয়ালা হাতে নিতেই মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল। রঞ্জন-কাকা বললেন, আসল সাঁওতালও আর নেই এই চত্বরে। কালে কালে কী হয়ে গেল সব! যেন দুঃখ প্রকাশ করলেন, এমন গলায় বললেন, এখন সেই আগের মত নিরাবরণ নিটোল শরীর আর চোখে পড়ে না। বিংশ শতকের যন্ত্রণা বল, অভিশাপ বল, সভ্যতা বা যান্ত্রিকতাই বল—সব এখন পয়সা চিনেছে। এখন জামা পরে গায়ে, জামার ভেতর ছোট জামা। নকলকে আসল করে তোলে শহরমার্কা ছুঁড়ীগুলোর মত। একটু যেন দম নিলেন, নিয়ে বললেন, আর মরদগুলোই বা কী? কাঁধে ট্রানজিস্টার ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, মহুয়ার বদলি পচা কারবাইডের চোলাই গিলে মৌজ করে। নাচে না, গায় না, দূর থেকে মাদলের রিনিঠিনি আর আমাদের সারারাত জাগিয়ে রাখে না।—পৃথিবীটা যত শৌখিন হচ্ছে, তত যেন চুপসে যাচ্ছে। হীরের মত জেল্লা জোনাকিরা সব গলায় পরে বসে আছে।

এতক্ষণ প্রসন্নকাকা বাইরে উদাসভাবে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ কথা থামিয়ে বললেন, যাঃ, কী যে সব বাজে বকছি, এই চল প্রসন্ন. আচ্ছা, বিকেলে আবার দেখা হবে।

আঙিনা পেরিয়ে ওঁরা ভেতরে চলে গেলেন। সুমিতা মাঠ দেখছিল, মাঠ নয় খোয়াই, বিস্তৃত দিগন্তজোড়া শূন্যতা যেন শুয়ে আছে। বেলা বড় হচ্ছিল। এরই মধ্যে হেমন্তের রোদে মাঠ উজ্জ্বল। বন্দী জলধারা চিকচিক করছিল। একটা টিয়ার ঝাঁক এই মাঠ, গাছ, এই রোদ আর সীতানালা পেরিয়ে লবকুশের দিকে উড়ে যাচ্ছিল।

বিকেলের রোদে আবার এসে হাজির। রঞ্জন আর প্রসন্নকাকা। আসার আগেই শ্যামলীর কল্যাণে আমাদের চা-পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমরা তৈরি হয়ে বসেছিলাম। রঞ্জনকাকা সেই সকালের সাজে এসেছেন। প্রসন্নকাকা কেন জানি, কাঁধে একটা সোয়েটার নিয়েছেন। হয়ত খুব সাবধানী বলে।

বাইরে এসে রঞ্জনকাকা সযত্নে কাঠের গেট বন্ধ করলেন। তারপর নরম রোদের ছায়া মাড়িয়ে আমরা গীর্জার দিকে হাঁটলাম। একসময় দাঁড়িয়ে পড়ে রঞ্জনকাকা বললেন, আজ তোমাদের দেখে মনে পড়ছে ঠিক তোমাদের মতই একদিন এসেছিলাম আমরা। আমি আর প্রসন্ন। ট্রেন তখন সবে এসেছে। তখন গীর্জার পাশ দিয়ে পায়ে চলা রাস্তা ছিল অভ্রের খনিতে। এখন বাস চলে একেবারে হনু-মানপোতা।—তা প্রায় তিরিশটা বসন্ত হয়ে গেল, না প্রসন্ন?

রঞ্জনকাকা বললেন, ওই বাড়িটা কথা বলতে পারলে আরো ভাল করে তোমাদের সব গল্প শোনাতে পারত।—তখনি মাধবীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় যার জ্বলন্ত স্মৃতি বুকে নিয়ে ছুটো জ্বলন্ত হৃদয় এখানে পড়ে আছে। মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে রঞ্জনকাকারা দূরে তাকালেন। আরো একটু হেলিয়ে পরলেন টুপিটা। কোন কথা না বলে আবার হাঁটলেন। গীর্জার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভেতরে ঢুকে আমি আর সুমিতা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। গীর্জার বুড়ো সাহেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সন্ধ্যা নামছিল। আবার ফেরার পথ ধরলাম আমরা।

আকাশে মেঘ ছিল না। হাওয়ায় মেঘ দাঁড়াচ্ছিল না। স্বচ্ছ, সুন্দর নরম রোদ্দুর মাঠে মাঠে, ঘাসে, গীর্জার চূড়োয় একটু আগেও ছড়িয়েছিল। মাঠে নেমে হাওয়ায় কান পেতে যেন কিসের শব্দ শুনলেন রঞ্জনকাকা। জানো, এই মাঠে, এই বেলা শেষের খোলা হাওয়ায় দাঁড়ালে মাধবীর কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাই। যেন ডাকে প্রসন্নকে। আমাকে নাম ধরে।

দ্রুত হেঁটে সামনের কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে বললেন, এস এস, একটু এখানে এসে দাঁড়াও! ওই যে দেখছ মাথা উঁচু গাছটা, রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গীর্জাকে ছায়া দেয়, এই হাওয়া ওই পাগলা সাহেবকে আরো উন্মত্ত করে। ওই গাছের নিচে ওর প্রেমিকার কবর। কতদিন দেখেছি বুড়োকে হাত ধরে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কখনো বুড়োবুড়ি 'সারমন' দিচ্ছে। হিন্দীতে লেখা পরিত্রাতা যীশুর গুণাবলী

বিলোচ্ছে। সেই মেমসাহেবের স্মৃতি নিয়ে সাহেবটা গাছের গায়ে কান পাতে। তখন সাহেবের জন্যে মেমসাহেবের কান্না শুনতে পায়। সাহেবের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সেই কান্নায় গলা ভিজিয়ে ফরাসী ভাষায় কতদিন গাইতে শুনেছি--জাঁ স জার্দ, ওই বাগানে, ইল ঈ আ দে দিয়াম অর্থাৎ অনেক মুক্তো ছড়ান আছে। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। গায়, কুড়নো শেষ হলেই ঘরে ফিরব। শেষ মুক্তোটা, লো দার্নিয়ের দিয়াম, চোখের জল মোছে, খুঁজতে খুঁজতে বেলা পড়ে এল। কিন্তু সেটা এখনো খুঁজে পেলাম না। লো দার্নিয়ের এমঁন আমুর, সেই শেষ মুক্তোটি আমার প্রেম। জো লো লুই আফ্রিঁরে, ঘরে ফিরে আমার প্রেমিকার গলায় পরিয়ে দেব।

কেন জানি প্রসন্নকাকার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। রঞ্জনকাকা কালভার্টের ওপর থেকে নেমে প্রসন্নকাকার হাত ধরে বললেন, চল্ প্রসন্ন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

আকাশ পরিষ্কার। জ্যোৎস্না উঠছিল। নীরবে এবার হাঁটলাম ক'জনে। আগে আগে প্রসন্নকাকার হাত ধরে রঞ্জনকাকা। পিছু পিছু সুমিতার হাত ধরে আমি। গেটের মুখে আসতেই দেখলাম, সেই মেয়েটা দাঁড়িয়ে। উদ্বিগ্ন চোখ। আমাদের দেখল ভাল করে। কিছু না বলে ভেতরে চলে গেল। প্রসন্নকাকা ভেতরে গেল না। ঝিলের দিকে। কিন্তু রঞ্জনকাকা মেয়েটির পিছু পিছু ভেতরে। আমরা আউট হাউসে ফিরে এলাম। কিন্তু পশ্চিমের চাতাল থেকে দেখলাম, মেয়েটি হনহনিয়ে ঝিলের দিকে এগোচ্ছে। তখনি প্রসন্নকাকা পুতুলের মত বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। মেয়েটিও পিছু পিছু।

সন্ধ্যা শেষের জ্যোৎস্না, সবুজ মাঠ, শ্যামল শোভার ওপর দাঁড়ালে রঞ্জনকাকা খানিক পরে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ধীর পায়ে আউট হাউসের দিকে আসতে আসতে আকাশ দেখছিলেন। চাঁদ। তারপর একেবারে আমাদের সামনে, চাতালের ওপর উঠে এসে বললেন, আর কতই বা বাকী, বেলা ত পড়ে এল। হিংসা, ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতি সব, সবকিছু পেছনে ফেলে চলে যাব। অনন্তে। সেই পরম

আনন্দনিকেতন। আজ অপরাহ্ণের রোদ বড় বেশী আমাকে তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল।

রঞ্জনকাকা হাসলেন, শব্দ না করে হাসলেন। এই রোদ যত বিড়ম্বিত করে তত মনে পড়ে যায় সব কথা। কিন্তু তখন দুঃখ হয়। না, আমার জন্য না। প্রসন্ন। তখন শুধু ভাবি, মৃত্যু তুমি মহান, তুমি দয়ালু, একসঙ্গে দুজনকে তুলে নিও।

কথায় কথায় চাতাল থেকে নেমে কজনে বাড়ির পেছন দিকে এলাম। কুয়োর কাছে। পাঁচিলের পাশে পাশে এখানে পেঁপে, পেয়ারা আর আতা গাছ। জ্যোৎস্নায় আরো সাদা হয়ে আছে গাছগুলো। কথায় কথায় ইতস্তত হাঁটতে হাঁটতে ঝিলের কাছে এলাম। নৌকোর দড়ি খুলে দিলেন রঞ্জনকাকা। বসলাম তিনজনে। আমি, সুমিতা আর রঞ্জনকাকা। আস্তে আস্তে নৌকো বাইলেন রঞ্জনকাকা। একটুখানি এসে দাঁড়ালেন তিনি। চুরুট ধরালেন। এই বয়েসেও রঞ্জনকাকাকে বড় উচ্ছল দেখাচ্ছিল। চুরুটে ঘন ঘন টান দিয়ে বললেন, প্রসন্ন আর আমি চিরকাল অভিন্ন বন্ধু ছিলাম। একদিন তোমার মতই চিঠি নিয়ে এলাম এই মৌভাণ্ডারে বেড়াতে। উদ্দাম যৌবন তখন, ফলে দুজনেই ভাবাবেগে উচ্ছল হলাম। ভাল-বাসতে চাইলাম দু'জনেই মাধবীকে। কলকাতায় ফিরে দু'জনেই যেতাম মাধবীদের বাড়ি। জজসাহেব আপ্যায়ন করতেন দু'জনকেই। —এরপর লক্ষ করতাম আমি আর প্রসন্ন যেন পরস্পরের কাছে থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। তাই একদিন মাধবীকে বললাম, মাধবী তোমাকে নিয়ে রাজার দেশে চলে যাব।

রাজার দেশ? মাধবী আঁচল জড়াত আঙুলে। হাসত। আচ্ছা রাজপুত্তুর, কোথায় তেমন দেশ?

তা ত জানি না।

হেসে লুটিয়ে পড়ত মাধবী। একসময় হাসি থামিয়ে বলত, প্রসন্নকে বলে দেব, তুমি পালাবে। তখন ওর চোখ দেখে মনে হত চোখে ওর মাধুর্য অপরিসীম। শিথিল কবরী ভেঙে যেত তখন। চূর্ণ

কুন্তলে হাত ডুবিয়ে বসে থাকতাম। মাননীয় অতিথির মত দীর্ঘ সময় পাশ দিয়ে চলে যেত।

বলতাম, প্রসন্ন কাল এসেছিল।

হুঁ। হাত সরিয়ে নিয়ে একটু সরে বসত মাধবী। এসেছিল।

বলব?

কী? তাকাত মাধবী। আঁচলটা ভাল করে শরীরে জড়িয়ে নিত। যেন ভয় পেত।

তুমি কাল মেঘরঙা শাড়ি পরেছিলে।

হুঁ।

প্রসন্ন বলছিল।

কথা বলত না মাধবী।

প্রসন্ন তোমায় ভালবাসে মাধবী।

জানি না। মাধবী ছুটে পালাতে চাইত। আঁচলটা ধরে বলতাম, আমার চেয়েও?

জানি না।

একটুকাল চুপ করে থেকে বলতাম, কাল বেলফুল জড়ানো ছিল খোঁপায়।

যেন ভয় চোখে তাকাত মাধবী। হুঁ। কিন্তু কী করে বুঝলে?

প্রসন্ন ভালবাসে তাই।

চূর্ণ দীর্ঘশ্বাসের খানিকটা অবলীলায় বাতাসে ভেসে গেলে বলতাম, প্রসন্ন দুঃখ পাক, চাই না। আমি চলে যাব।

কেন? মিনতির গলায় বলত মাধবী।

অন্ধকার নামত আমাদের ঘিরে। হয়ত জ্যোৎস্না উঠত। দীঘল সন্ধ্যা পার হয়ে যেত চোখের ওপর। চোখ দিয়ে জল গড়াত মাধবীর। মাথা হেঁট করে বলত, জানো—

কি?

গলায় আমার একটাই মালা। উঃ! আমি কী করি বলত। ফুলে ফুলে কাঁদত মাধবী। এই, বল না?

সেই থেকে আমি নিরুদ্দেশ। এতক্ষণ পরে চুরুট মুখে তুললেন রঞ্জনকাকা। আমাদের বললেন, আচ্ছা বলত, বড় কে? নারীর জন্য একজন পুরুষের ভালবাসা, না বন্ধুর সুখের জন্য ভালবাসাকে উপেক্ষা করা। কে বড়, দু'জনে আমরা যতদিন এই পরবাসে বাঁচব ততদিন ভাবব। উত্তর খুঁজব। কিন্তু এর উত্তর বোধহয় নেই। কি বল? এক একদিন মনে হয় বন্ধুত্ব। প্রসন্ন বলে, ভালবাসা।

দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশে কাটিয়ে, যৌবন হারিয়ে একদিন ফিরলাম এই মৌভাণ্ডারে। সুযোগও হয়ে গেল। অবনীবাবু বাড়িটা কিনেছিলেন। তিনি বেচে দিলেন আমাকে। তারপর আমারই গেস্ট হয়ে রইলেন আউট হাউসে।

রঞ্জনকাকা বড় করে একটা নিঃশ্বাস নিলেন। এ বাড়িতে এসে কেমন একটা তৃপ্তি পেলাম। মাধবীকে আবার নতুন করে মনে পড়ল। নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে সূর্যাস্ত দেখি। বর্ষার জলধারা। প্রচ্ছন্ন শোভায় মৌভাণ্ডারের পূর্ণতা। ঠিক এমন সময় একদিন প্রসন্ন এসে হাজির। অবনীর কাছে খবর পেয়ে কত সুখে আছি দেখতে। দুটো হাত ধরে বলল, আমার জন্য সব ছেড়েছ তুমি। সুখ, সংসার। জীবনের অবলম্বন উপেক্ষা করে তুমি আমাকেও ভুলে গেছ। আজ আর আমায় তাড়িয়ে দিও না। প্রসন্নর নিশ্বাস দ্রুততর হচ্ছিল। বলল, যখন আবিষ্কার করেছি, বাকী জীবনটুকু প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে বন্ধুত্ব নিয়ে বেঁচে থাকব। তোর সুখে হাসব, দুঃখে কাঁদব, বিশ্বাস কর—এটাই চেয়েছি চিরকাল। নিঃস্ব, একক জীবন নিয়ে সব ভুলে, মাধবীকে ভুলে, এই দীর্ঘকাল তোকেই শুধু খুঁজে বেড়িয়েছি।

জোরে জোরে হাল মেরে দ্রুত ফিরে এসে গাছে বাঁধলেন নৌকোটা রঞ্জনকাকা। তারপর হনহনিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন। চাতালে এসে দাঁড়ালাম দু'জনে। আমি আর সুমিতা। সিরসির শব্দ হচ্ছিল হাওয়ায় ইউক্যালিপ্টাসের পত্রালীতে। দূরের লবকুশ পাহাড় আরো স্পষ্ট। শেকল খুলে দেখলাম দু'জনের খাবার সাজান ঘরে। হোল্ড-

অল খুলে সুন্দর করে বিছানা পাতা। একটা কাচের গ্লাসে কিছু ফুল সাজিয়ে রেখে গেছে শ্যামলী।

তবু বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কে যেন ঘাটের দিকে যাচ্ছে। চুপি চুপি নিচে নেমে এলাম। ইউক্যালিপ্‌টাসের পাতায় হাওয়ার সিরসিরানি। সে হাওয়ায় কানে এল, ভেতরের মহলে রঞ্জন আর প্রসন্নকাকার কি নিয়ে যেন ভীষণ কথা-কাটাকাটি চলছে। কখনো চাপা গলা, কখনো উত্তেজিত। দু'জন দুজনকে ভীষণভাবে শাসাচ্ছে। কখনো বিশ্রীভাবে চীৎকার করছে। তবু ঘাটের কাছে গেছি। যেতেই চমকে উঠেছি। শ্যামলী?

হ্যাঁ।

তুমি এখানে?

দেখুন না, ওরা ঝগড়া করছে।

ঝগড়া?

হ্যাঁ। আমাকে নিয়ে। বড় সাহেবের অভিযোগ আমি ওদের বন্ধুত্ব কেড়ে নিয়েছি। ছোট সাহেবের অভিযোগ, তবে তাড়িয়ে দিস না কেন? বন্ধুত্বকে তুই সম্মান দিতে জানিস না। কতদিন না বলেছি ওকে খালাস দে?

শ্যামলী কাঁদছিল। অভ্রের খনিতে কাজ নিয়ে কতদিন ভেবেছি চলে যাব। পারি না। ওরা কাঁদে। কিন্তু আমি ত একটা ঝি। যৌবনে যা ভাঙল না, এই অন্তিমে সেই বন্ধুত্ব আমার জন্যেই বা ভাঙবে কেন? আমি চলে যাব।

আকাশ আরো স্পষ্ট। টিলার মত ছোট ছোট পাহাড়গুলো দূরে বেশ ধবল। আরো পরিষ্কার—পশ্চিমের খোয়াই। কামিনী ফুলের ওপর কিছু জোনাকি জ্বলছিল। কিছু যেন ভাল লাগছিল না। ভেতরে এসে নিয়মমাফিক সুমিতার গলা জড়িয়ে আদর করলাম। ওর সাদা ঘাড়ে ধবল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছিল। জ্যোৎস্নার জলে ভিজে যাওয়া সাদা ঘাড়ে অনেকক্ষণ মুখ গুঁজে এক সময় উঠে দাঁড়ালাম। নগ্ন দেহ সুমিতার। ও ক্লান্ত। সোহাগের স্পর্শ দিয়ে ওর শরীরের

ওপর শাড়িটা টেনে দিলাম। কেন জানি মনে হচ্ছিল, এই দেহ, প্রেম অথবা ভালবাসা একটা নিয়মমাফিক প্রলোভন মাত্র। সেই প্রলোভনের অন্তিমে আমার পরিণাম কী ভয়ঙ্কর! মনে হচ্ছিল, আমি যেন পলিত কেশ, লোলচর্ম, অস্থিচর্মসার। আমার দেহ জরা-বার্ধক্যে জর্জর। তখন আমার মৃত্যুর মুখে কারা দাঁড়িয়ে? বিত্ত, অর্থ, সম্মান, সৃষ্টি, এই যে বিরাট রাজ্যপাট, এইসব কিছু যখন পেছনে ফেলে রেখে ম্লান হেসে চলে যাব তখন কার ম্লান মুখ দেখে যাব? এমন সব অর্থহীন কল্পনা আমার মস্তিষ্ককে কেমন ঘুলিয়ে দিচ্ছিল। তত সুমিতার নগ্ন দেহটাকে দু'হাতে সজোরে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু পারছিলাম না, প্রেম, ভালবাসা ওসব বাজে কথা, শুধু সারা-জীবনের অবলম্বন বলে।

মস্তিষ্কটা ঘুলিয়ে উঠলে আমি আবার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। চুপি চুপি এগিয়ে এলাম আঙিনা পেরিয়ে। বাইরে থেকে জানলা দিয়ে উঁকি দিলাম। রঞ্জনকাকা উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। পাশে হার্নিয়া-বেল্টটা পড়ে আছে। মাথার পাশে একটা টিপয়-এর ওপর ওষুধের শিশি। বোধহয় কাঁদছেন রঞ্জনকাকা। সমস্ত শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে। সামনের টেবিলের ওপর খাবার সাজানো।

চুপি চুপি আরেকটু এগিয়ে পাশের ঘরে উঁকি দিলাম। প্রসন্ন-কাকার ঘর। প্রসন্নকাকা চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালেন। খাবারের থালাটা সযত্নে দু'হাতে ধরে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। রঞ্জনকাকার ঘরের সামনে রঞ্জনকাকার প্রিয় কুকুরটা শুয়েছিল। আদর করে তাকে তুলে মাথায় হাত বুলোলেন। তারপর থালাটা সযত্নে সামনে নামিয়ে রাখলেন। প্রসন্নকাকার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। তারপর ঘরে ঢুকে আলো নিবিয়ে দিলেন।

আকাশ যেন আরো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কিছু মরসুমী ফুল ফুটেছে টবে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম। আবার ফিরে এলাম রঞ্জনকাকার ঘরের দিকে। রঞ্জনকাকা ঘরের ভেতর নেই। একটা কৌতূহল আমার চোখে উঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ঢুকলেন

রঞ্জনকাকা। কোলের ভেতর প্রসন্নকাকার তিনটি সদ্য পোষা বেড়াল-ছানা। রঞ্জনকাকা রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দুধে ভেজালেন। তারপর সমান ভাগে তিনজনকে ভাগ করে দিলেন। পরম যত্নে আর স্নেহে আদর করে চুপি চুপি বললেন, এতটুকু ফেলে রাখলে ভীষণ মারব।

মনে পড়ল, সকালে ঠিক এমনি করে আদর করছিলেন প্রসন্নকাকা। বেড়াল ছানা তিনটের গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে বলছিলেন, তুই বকুল, তুই পারুল, আর তুই হলি চম্পা। পেট ভরে খা, নইলে ভীষণ মারব।

দিনের শেষে

ভিড় পাতলা হতে সময় লাগল। কিন্তু ট্রেনটা দাঁড়াল আর ছাড়ল। বহু লোকের হই-হুল্লোড়, বিক্ষিপ্ত ব্যস্ততা এবং অস্থিরতা একসঙ্গে ছিটকে পড়ল প্ল্যাটফরম-এর ওপর। আর ট্রেনটা ছেড়ে চলে গেলে তা যেন আরও বেশী করে বোঝা গেল। ধীরে-সুস্থে, গা বাঁচিয়ে চলার মত অত সময় ছিল না হাতে। সকলের মত ব্যস্ত পায়ে লাইন ডিঙিয়ে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালে ট্রেনের শেষ গোলাকার অস্তিত্ব নিমেষে চোখের ওপর থেকে মুছে গেল। আরও ব্যস্ত পায়ে লাইন ডিঙোল মিনতি। এমন কি, ওভার-ব্রীজের ওপর দিয়ে নিরাপদ রাস্তাটুকু পার হওয়ার মত অত সময় নেই হাতে।

ব্যস্ত ভিড়ের গোলকধাঁধা থেকে মিনতি খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালে প্রথমে কেমন সংকোচ এসেছিল। তারপর সলজ্জ পদক্ষেপে আর একটু এগিয়ে এসে থামল। আরে, অবনীদা না?

তাকাল অবনী। উচ্ছল এক ঝলক হাসতে হাসতে বলল, তুমি?

সেই সঙ্গে মিনতিও হাসল। বলল, আমি ত ভাবছিলাম, ডাকব কিনা। কী জানি, যদি আবার চিনতে না পার।

তখনও নির্মল হাসি অবনী ছুঁইয়ে রেখেছে দুটো ঠোঁটের ওপর। প্যান্টের পকেটে হাত ডুবিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল অবনী। যাও, কী যে বল! মন্তব্য করল অবনী। চোখাচোখি তাকাল অবনী। তুমিও কিন্তু বেশ বদলে গেছ।

একটু কুঁকড়ে, যেন খানিক নীচু হয়ে শরীরের ভাঁজ লুকোবার চেষ্টা করল মিনতি। একটু মিহি করে হেসে বলল, তুমি কিন্তু ঠিক আগের মতই রয়ে গেছ।

নড়ে-চড়ে হাসল অবনী। শব্দ হল না।

এখানে? প্রশ্নালু চোখে মিনতি বলল। ট্রেন থেকে নামলে বুঝি?

ধ্যেত। এটাই ত পথ আমার। অবনী রসিকতা আনল গলায়। আর কিছু ডিঙোতে না পারলেও দিনে লাইন ডিঙোতে হয় বার দুই অন্তত। হাসল অবনী। কসবায় থাকি এখন।

নাকি? অবাক চোখে তাকাল মিনতি। কালীঘাট ছেড়ে দিয়েছ?

কবেই। আবার হাসল অবনী। তুমি চলে যাবার পরই। অবনী বলল, চল হাঁটি। হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি।

বালিগঞ্জ স্টেশন সীমানা ছেড়ে ওরা হাঁটল। মিনতি পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল, কত দিন পরে তোমাকে দেখলাম বল ত।

তা ঠিক। বছর ছয়েক ত নিশ্চয়ই। ভুরু দুটোকে ওপরে তুলল অবনী।

না। খুব শান্ত গলায় জবাব দিল মিনতি। এখনও দু'মাস বাকী ছয় হতে।

অবনী লম্বা করে উচ্চারণ করল, অ-নে-ক দিন।

ওরা এবার হাঁটতে হাঁটতে বাসের কাছে এল।

মিনতি আবার ব্যস্ততা দেখাল। না বাস, না ট্রাম, কী বল ত শহর তোমাদের। আমি না হয় এখন মফস্বলের বাসিন্দা হয়ে গেছি।

রাস্তায় আটকে আছে কোথাও। অবনী বলল। প্রসেশন-টসেশনে পড়ে গেছে হয়ত।

ঘড়ি দেখল মিনতি। ইস্ দেরী হয়ে যাবে।

কিসের এত তাড়া তোমার? অবনী ভৎসনার সুর ঢালল গলায়। খালি তাড়া আর তাড়া। অবশেষে অবনী হাতের কাছে একটা ট্যাক্সি পেয়ে ডেকে বসল। বলল, কত দিন পরে দেখা, তোমাকে কখনও কষ্ট দিতে পারি? ওঠ।

মিনতি উঠল। বেশ কুঁজো হয়ে ঢুকে আরাম করে বসল। বলল, আমি কিন্তু ভবানীপুর যাব অবনীদা। তুমি?

আমিও। অবনী বলল।

গাড়ি স্পীড নিল। দুপুর গড়িয়ে এখন বিকেল। কিন্তু অন্য দিনের মত অত রোদ নেই আজ। সারা দিন কেমন মেঘলা ছিল। অথচ বাতাসের জন্যে মেঘ দাঁড়াচ্ছিল না। যদিও মেঘ দাঁড়ানোর বিকেল এটা নয়, অবনী বুঝল। অবনীর মনে হচ্ছিল, শীতের বিকেল-গুলো যেন বড্ড তাড়াতাড়ি চুরি হয়ে যায়। বেশ দূরত্ব বজায় রেখে অবনী কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল।

কী অত ভাবুকের মত চুপচাপ বসে আছ যে?

অবনী তবু কথা বলল না।

এই—

কী।

কথা বলছ না যে। আলতো ধাক্কা দিল মিনতি।

বাইরে ছড়ান দৃষ্টিটা ভেতরে গুটিয়ে এনে অবনী বলল, বল।

কিছু বলল না মিনতি। দেখতে দেখতে গড়িয়াহাটার মোড়ে লাল বাতিতে দাঁড়িয়ে গেল ট্যাকসিটা। অবনী এতক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরাল। জিবের ওপর থেকে ধোঁয়াগুলো গলার দিকে চালান করে দিয়ে বলল, আগের চেয়ে একটু যেন রোগা হয়ে গেছ। তারপর গলার ভেতর থেকে ধোঁয়াগুলো নিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, এমনিভাবে অপ্রত্যাশিত দেখা হয়ে যাবে, এ কিন্তু ভাবতে পারিনি কোন দিন।

একটা ঝাঁকানি দিয়ে ট্যাকসিটা স্টার্ট নিল। মিনতি অবনীর হাঁটুর ওপর হাত দিয়ে ঝাঁকানিটা সামলে নিয়ে বলল, আমিও।

অবনী আর কোন কথা বলল না। অনেকক্ষণ ধরে কী যেন ভাবল। ভাবতে ভাবতে এক এক সময় অবনীর বেশ ভাল লাগছিল। ...বয়েস তখন কতই বা হবে অবনীর। যদিও স্কুল ছাড়ার চৌকাঠের ওপর নামে মাত্র আঙুল ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে তখন। দু' পাশে দুই অন্তরঙ্গ, দীপু আর প্রবীর। দীপু একদিন স্কুলের পেচ্ছাবখানার পাশে

মেহেদী-পাতার অগোছাল বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে বলেছিল, আমি মাইরি বকে গেছি একেবারে।

কী করে বুঝলি?

কী জানিস, দীপু ইতস্তত করে গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলেছিল, মানে, ইয়ে, কী জানিস—

কী?

না, মানে।

কিসের মানে?

কী জানিস, দীপু বলেছিল, একটু ভাল গোছের মেয়ে দেখলে আমার ভেতরটা কেমন হয় মাইরি। একটু থেমে দীপু বলেছিল, আচ্ছা, মেয়েদেরও এমনি হয় না?

কী জানি! অবনী বলেছিল।

ওরা প্রকাশ করে না। হয় রে। তুই জানিস না।

দীপু সিগারেটে সুখটানটা দিয়ে মেহেদী-গাছের বেড়া ডিঙিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল, দেখ না, আমার কত বড় বড় গোঁফ উঠেছে মাইরি। একদিন ভাবছি চুরি করে বগল কামাব শালা। কী বলিস?

অবনীও অবাক হয়েছিল! সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা তখনও তার স্পষ্ট ঠোঁটের ওপর। দীপু বলেছিল, আচ্ছা, তোর কিছু হয় না?

হয়। কেমন অসংকোচে অবনীও স্বীকার করেছিল।

আমার একটা ঘটনা আছে, বলব একদিন। দীপু একটা খুব সবুজ গোছের মেহেদী-পাতা ছিঁড়ে নিয়েছিল।

বল না, এই বল না। অবনী আর একটু কাছে সরে এসেছিল।

কচিগোছের মেহেদীপাতায় চোখ রেখে দীপু বলেছিল, আমি একটা মেয়েকে ভালবাসি।

মেয়েকে?

ক্যা-ব-লা! লম্বা করে উচ্চারণ করে দীপু বলেছিল, মেয়ে ছাড়া কাকে? জানিস অবনী, আর সে এখন ফ্রক পরে না। সাদা শাড়িতে

যা দেখায় না মাইরি। একটু থেমে দীপু আবার বলেছিল, কী জানিস, মনে হয় সব সময় তাকে দেখি, কথা বলি, একটু জড়িয়ে ধরি. অথচ সামনে গেলে কেমন হয়, ভাল করে তাকাতে পারি না, কথা বলতে গেলে কেমন জড়িয়ে যায়। জিবে জল থাকে না।

অবনী তাকিয়ে ছিল। বুড়ো মালীটা এই গাছগুলোর যত্ন নেয় না বলে নাকি, এপাশের বেড়াটুকু বেশ স্বাধীন, লতাপাতা আর আগাছায় ভরতি। অথচ কেমন যেন আত্মসুখে পরস্পরে একাত্মতায় বেঁচে আছে। কিন্তু গেটের মুখে? এখন বোগনভিলা ফুটে আছে। অথচ এই মেহেদীর সংসার? অফুরন্ত আনন্দে যেন ঢলে আছে। মগ্ন আবেগে কী একটা নেশায় মজে আছে। এই অবাধ আর অবিমিশ্র স্বাধীনতা এবং সুষমা যেন এক এক সময় এই বোগনভিলার সুন্দরী-পনাকেও হার মানায়।

এই বল না। অবনীর কাঁধে হাত দিয়ে দীপু অভিমান এনেছিল গলায়। বলনা রে?

অবনী তাকিয়েছিল। যদিও ভালবাসার প্রতি এই বয়েসে এত জ্ঞান থাকার কথা নয় ওদের। অন্তত অবনীর। তবু কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, প্রেম-ভালবাসা, এসবের কথায় কেমন একটা শিহরণ জাগত। প্রজনন, পয়োধর পীন, রজঃস্বলা, এই সমস্ত কুলীন শব্দের স্বাত্ব ব্যাখ্যা করত প্রবীর। বাংলায় প্রথম হত প্রবীর। এই প্রবীরই সঙ্গে করে এনেছিল এ-বাড়িতে।

মিনতি সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কোঁকড়া চুল। অগো-ছালো। পাতলা ঠোঁট। বাঁ গালের একটু নীচে একটা তারার মত আঁচিল। ফ্রকের দিন সত্যি সত্যি শেষ হয়ে আসছে এমন একটা সলজ্জ উদ্বিগ্নতা যেন ওর ভুরু দুটোকে ছুঁয়ে আছে।

প্রবীর ফেরার পথে বলেছিল, পারলে মেয়েটাকে ভালবাসিস।

অবনী মাথা নীচু করে হাঁটছিল। কথা বলছিল না।

ওরা খুব দুঃখী। মা নেই ওদের।

অবনী কান দিচ্ছিল না, এমনভাবে হাঁটছিল।

পিসীমাদের কেমন যেন আত্মীয় হয়। দূর সম্পর্কের।

পড়ে না? অবনী অনেকক্ষণ হাঁটবার পর বলেছিল।

পড়ে, আমাদের সঙ্গেই পরীক্ষা দেবে। ওর বাবা দাঁত বানায়।

সে কি? অবাক বিস্ময়ে অবনী বলেছিল। ভদ্রলোককে শ্বশুর করতে পারিস। বিনা পয়সায় পাটি পাটি দাঁত পাবি। দাঁতের কারখানায় চাকরি করেন ভদ্রলোক।

এতক্ষণ পরে মিনতির দিকে তাকাল অবনী। সিগারেটের ধোঁয়া এতক্ষণ পরে বাইরের দিকে ছুড়ে দিতে দিতে মিনতিকে দেখল। বড় চুপচাপ বসে আছে মিনতি। হাওয়ায় ওর আঁচল উড়তে দেখল অবনী।

হঠাৎ অবনীর মনে হল, এই বিকেলগুলোর কেমন একটা অন্য চেহারা কেমন একটা অন্য স্বাদ আছে। শহরের ওপর বিকেল বড় একটা দেখা হয় না অবনীর। চারিদিকে ওষুধ, গন্ধ, হাড়, ওষুধে ডোবান লাশ, মাথার খুলি এবং নীলচে রঙের স্পিরিটে ডোবান লাশের চোখ—এই বিচিত্র এবং ভয়াবহ পরিবেশ তার আফিসের চার দেওয়ালের ভেতর বন্দী। এই বন্দিত্ব থেকে অবনী যখন বাইরে আসে এবং এসে খোলা হওয়ায় চোখ খোলে, তখন বিকেল মরে গেছে কখন। তার অন্তিম অস্তিত্বটুকু দেখতে না-দেখতে ফুরিয়ে গিয়ে সন্ধ্যার আলো-আঁধার ধুলোধোঁয়া এবং সেই একঘেয়ে আর আটপৌরে দৃশ্য সঙ্গী করে বাড়ি ফেরা। ট্যাকসি চলছিল। অবনীর হঠাৎ ভাল লাগল কেমন। মিনতিকে দেখল।

আজ তোমার অফিস ছিল না অবনীদা?

ছিল, অবনী বলল।

তবে যাওনি যে?

না।

অফিস ফাঁকি? মিনতি হাসল।

না। কাজ। অবনী একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমারও একটা জরুরী কাজ ছিল।'

তাই বল। মিনতি ওপর নীচে মাথা নাড়ল। কাজ ছাড়া বিনা কাজে ঘোরবার ছেলে নাকি তুমি? মিনতি একটু হালকা চালে হাসল। কাজ মানেই ত ফিকির। কী জানি এত দিনে কোটিপতি হতে পেরেছ কিনা, কোন রাজরানী জোটাতে পেরেছ কিনা।

পারিনি। অবনীও হালকা চালে হাসল। ট্যাকসি চলছিল। রাসবিহারী অ্যাভিন্যু ঘুরে এবার চৌরঙ্গীমুখো হল। অবনী বলল, খুব কাজ নাকি তোমার?

ভীষণ জরুরী। মিনতি কপাল কুঁচকালো।

কোথায় নামিয়ে দিতে হবে বলো। অবনী সিগারেটের অন্তিম অংশটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে।

রাজ্যের কথা অবনীর জিবের ওপর জট পাকালেও সব কেমন গুলিয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। বারবার অবনীর মনে হচ্ছিল, পৃথিবীটা যেন অদ্ভুত, বড় আশ্চর্যরকমের। বংশবৃদ্ধি, মৃত্যু, দুঃখ-সুখ, সহবাস, কিছু অভাব, কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত—এসব কেমন মিলে-মিশে একাকার এবং প্রচ্ছন্ন দাঁড়িয়ে আছে। সুখকে হাত ধরে টানলে দুঃখ মাথা নাড়ে। দুঃখকে ভয় পেলে সুখ যেন তারই ছায়ায় অদৃশ্য হয়। একটা আবর্তে মানুষগুলো, তাবৎ প্রাণীগুলো কেমন অবিরাম ঘুরছে, পাক খাচ্ছে। অথচ স্নেহ, মায়া-মমতা, ভালবাসা, প্রেম, প্রণয় তারই চোখের ওপর পঙ্গপাল সেজে দাঁড়িয়ে আছে। অবনী এতক্ষণ পরে বলল, 'আমাকে আঘাত দিয়ে কথা বললে যদি তুমি শান্তি পাও, তবে আমার আপত্তি নেই। রাজরানী আমি চেয়েছি কোন দিন?' অবনী এবার মিনতির আঙুলটা ছুঁল।

মিনতি একটা উত্তাপ অনুভব করল রক্তে। শিরায়। আঙুলটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আমি এলগিন রোডে নামব কিন্তু।'

নামবে। হাতটা নিজের কোলের ওপর রেখে খুব নিরুত্তাপ উচ্চারণ করল অবনী।

মিনতি এতক্ষণ পরে হাসল। কী দুঃখ পেলে নাকি?

অবনী চুপ করে বসে থাকল।

মিনতি আরেকটু সরে এসে আঙুল কটা ছুঁল। তেমনি হাসতে হাসতে বলল, 'কবিরা ত বলেন, দুঃখ পাওয়া ভাল। অন্তরের মহিমা নাকি বাড়ে তাতে।'

এসব তুমি আমাকেই বলছ মিনতি। আমার অক্ষমতাকে আঘাত দিচ্ছ। আজো তুমি অভিমান করে আছ। তাই প্রতিশোধ নিচ্ছ। অবনীর স্বর কেমন গাঢ় শোনাল।

এলগিন রোড?

না। অবনী বলল।

মিনতি হেসে হালকা করতে চাইল পরিবেশটা। তোমাকে গম্ভীর দেখালে যেন তোমার ওজন বেড়েছে বলে মনে হয়।

অবনী বলল, 'নামো, এলগিন রোড।'

মিনতি নামল।

অবনীও নেমে ট্যাকসির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বলল, কোন দিকে তোমার?

মিনতি তখনো ইতস্তত করছিল। বিকেলের রোদ আরেকটু যেন মরেছে। শীত আসি আসি করেও এখনো আসেনি। অথচ শীত-ছুঁই-ছুঁই বাতাসে গা ভাসিয়ে কিছু বক কি শঙ্খচিল মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। অবনী বলল, 'তুমি উড়ো পাখির ঝাঁক দেখতে খুব ভালবাসতে।'

মিনতি তখনো দাঁড়িয়ে। অবনী বলল, 'আমরা শেষ কোথায় একসঙ্গে বসেছিলাম বল ত? মনে আছে তোমার?'

মিনতি তাকাল।

তুমি সেদিন কী শাড়ি পরেছিলে আজো আমার মনে আছে। মেঘরঙা।

হুঁ, মাটির দিকে চোখ করে মিনতি এতক্ষণ পরে জবাব দিল। তোমার প্যান্টে সেদিন গাড়ির কাদা ছিটকে লেগেছিল।

বর্ষায় গড়ের মাঠ ভিজে ছিল সেদিন। অবনী যোগ করল।

হুঁ।

তার আগের দিন খুব শিলাবৃষ্টি হয়েছিল না ?

হুঁ। মিনতি জবাব দিল।

ওরা দুজন এবার ঘন হয়ে দাঁড়াল। আকাশ দেখল। পাশ দিয়ে চলা লোকজনগুলোকে কোন ভ্রূক্ষেপ করল না। অবনী বলল, সেদিন চুলে তোমার যুঁই-তেলের গন্ধ ছিল।

তোমায় চিনেবাদামওয়ালা একটা অচল সিকি দিয়েছিল। তাই না ?

তাই। অবনী বলল। হাসল।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা তারপর আউট্রামে গেছ্লাম, মনে পড়ে ?

পড়ে না ?

ঘাটে অনেক নৌকো ছিল। তুমি কি বলেছিলে, তোমার মনে আছে ?

মিনতি চুপ করে থাকল।

বিকেলের অল্প রোদে শীতের রেশ মিশে যাচ্ছিল। বাতাস দিচ্ছিল। বিকেলের রং আরো গাঢ় হচ্ছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবনী জুতোর মাথা দিয়ে একটা ঢিল ওঠাল। অবনী একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে গোপনে ভাসিয়ে দিয়ে বলল, 'যেন মনে হয় সেদিনের কথা, অথচ কত দিন হয়ে গেল, না ?'

মিনতি তবু হাঁটল না।

তুমি যাবে না ? অবনী বলল, 'দেরি হবে না ?'

বিকেলের রোদ আস্তে আস্তে চোখের ওপর থেকে মুছে যাচ্ছিল। মিনতি ঘড়ি দেখল। আমি হাসপাতালে যাব। পি-জি-তে।

পি-জি ? অবনী বিস্ময় প্রকাশ করে বলল।

হ্যাঁ।

আমিও ত। আমাদের অফিস-কলিগের অপারেশন কাল। অবনী খুব অবাক গলায় বলল, 'আশ্চর্য ত। তুমিও ?'

আমার বাবা আছেন হাসপাতালে।

ও। অবনী বলল।

ওরা এবার হাঁটল। বিকেলের রোদ সামনেই একটা মন্দিরের

কার্নিসের ওপর তখনো মুমূর্ষুর মত। ফুটপাতের ওপর দিয়ে নীরব হাঁটল ওরা। এক সময় অবনী সিগারেট ধরাতে গিয়ে থামল। থেমে বলল ভদ্রলোকের বেশ বয়েস হয়েছে। হয়ত—

মিনতি দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হয়ত কি? মিনতি বলল।

না, মানে, অবনী ইতস্তত করে বলল, আজকাল কোন ভয় নেই, মানে অপারেশনে। বিশেষ করে ভীষণ উন্নতি হয়েছে এখন সার্জারি-টার। দেখছ না, হৃদয় নিয়ে কী দারুণ একস্‌পেরিমেণ্ট চলছে। পুরুষদের অকেজো হৃদয়গুলোকে দেখছ না তরুণীদের হৃদয়গুলো কেমন বাঁচিয়ে রাখছে? বলে অবনী একটু হাসল। অবনী ধোঁয়া নিল টেনে। বলল, তবে গেলেই ভাল। এ জগতে যে যায় সেই বেঁচে যায়।

মিনতি কপাল কুঁচকে অবনীকে দেখল। তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবনী ধোঁয়া ছাড়ল। অবনী তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, 'কী বল, ভাল নয়?'

মিনতি কিছু বলল না।

অবনী ধোঁয়া গিলল। গিলে বলল, 'কেউ ঘৃণা করত, কেউ সহানুভূতি দেখাত, কেউ কেউ বলত, বুড়োর বদ খেয়াল আছে। বাইরে নাকি ফাউ সংসার আছে একটা।' অবনী গলা তুলে অর্থপূর্ণ হাসল।

মিনতি অবনীকে দেখছিল। অবনী একটু কাশল। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিয়ে বলল, ভদ্রলোক কী যে ধরেছিল না আমাকে! বাব্বা!

কী?

একেবারে নাছোড়বান্দা। গচাবেই একটা। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'ভদ্রলোক শেষ পর্যন্ত কী করেছিল জান?'

কী? মিনতি ডাইনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

প্রতি মাসে লটারীর টিকিট কিনত একটা করে। আর—

আর?

দুখানা করে খাম কিনে দিত পাঁচ মেয়েকে।

কেন? মিনতি তেমনি অবাক বিস্ময়ে ঘাড় ফিরিয়েই বলল।

কেন আর? 'পাত্রী চাই' কলম থেকে যে যার যোগ্যতামত নিজেরাই উত্তর দেবে বলে। গলা ছেড়ে হা হা করে একটা নাটুকে হাসি হাসল অবনী। হেসে বলল, তাই ভাবলাম যাই একবার, দেখে 'আসি; কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর তুমি এমন মনটা খারাপ করে দিলে, যেন আর ভালই লাগছে না। তোমার সঙ্গে দেখা না হলেই ভাল হত।

মিনতি হাঁটছিল না! এখন অবনীকে দেখছিল না।

জানো মিনু, মানুষ যা ভাবে, তা যদি হত? একটা দীর্ঘশ্বাস চুরমার করে গোপনে ভাসিয়ে দিল অবনী। হয় না। অবনী ছোট্ট করে উচ্চারণ করল।

বাতাসে রোদের শেষ ম্রিয়মাণ বিন্দু শুকিয়ে যাচ্ছিল। মন্দিরের কার্নিস থেকে রোদ মরে গেলে মিনতি তাকাল। অবনীকে দেখল।

মরা মানুষের হাড় নিয়ে কাববার আমাদের, অবনী বলল। একেক সময় হাঁফিয়ে উঠি। অথচ কত সাধ ছিল বল ত! ডাক্তার হব। মড়া কাটব। একটু থেমে আবার বলল, অথচ চাকরি যা করি তাতে মড়া আছে, ডাক্তার আছে। কাটাই ছেঁড়াই আছে। কিন্তু আমি? একটা উঁচুদরের হকার বই ত নয়! হাসল অবনী। বলল, ওই মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ বল আর সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ বল, সব বাবু হকার। তবে একটু উঁচুদরের। ম্রিয়মাণ হাসল অবনী। টাই-স্যুট পরে ভুল ইংরেজী বললেই কি আর সাহেব হওয়া যায়! বুঝি, কিন্তু কি করি বল। সাধের সঙ্গে সাধ্যের সতীনের সম্পর্ক না হলে কত আত্মাই সুখী প্রেমিক হয়ে যেত।

অবনী চুপ করে থাকল অনেকক্ষণ। মন্দিরের কার্নিসে কি চিলে-কোঠায় রোদের বিন্দু আর চোখে পড়ছে না অবনীর। অনেকক্ষণ পরে অবনী বলল, সেদিন স্কুলের একটা অর্ডার ছিল। একটা কঙ্কাল ল্যাবরেটরীতে সেট করে দিয়ে হাঁ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম

কঙ্কালটার দিকে। মরা মানুষের কঙ্কাল। লাশটাকে কেমনভাবে কোম্পানী পেয়েছিল, কীভাবে কিনেছিল, কোন্ ডাক্তার চেরাই করেছিল, কত পারসেন্ট প্রফিট করল কোম্পানী, চাকরি হিসেবে এসব কথাই না মনে হবার কথা। আর তাতেই না প্রসপেক্ট! তা কিনা মনে হল স্কুল-জীবনের কথা। গেটের মুখে কত বোগনভিলা ফুটে আছে। তোমার বাঁ গালের তারার মতন আঁচিলটা মনে পড়ল।

অবনী এবার হাঁটল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, তাই ভাবলাম, যাই একবার দেখে আসি। মরে গেলে লাশটা ত আমরাই পাব, তাই একবার তদবির করে আসি। অবনী দুঃখপূর্ণ গলায় হাসল।

সামনে একটা মিষ্টির দোকান পেয়ে অবনী থামল। বলল, দাঁড়াও একটু মিঠাই কিনে নিই। যাবার আগে একটু নলেন গুড়ের সন্দেশ খাইয়ে দিই।

অবনী সন্দেশের বাক্স হাতে নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, চল। হাঁটতে হাঁটতে বলল, ভদ্রলোক কী সুখী বল ত! হাড় বেচে পয়সা নিল জ্যান্ত অবস্থায়। আমাদের হাড়, দাঁত, চোখের মণির কোম্পানী শ্রমিকদের যেন চোখের মণি। না?

মিনতির পা টলছিল। কোন উপায়ে চোখের জল লুকিয়ে গেটের মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মিনতি।

চল, তার চেয়ে তোমার বাবাকেই বরং দেখে আসি। অবনী বলল, জিজ্ঞেস করলে বলে দিও না যা হয় কিছু একটা। যা হয় একটা পরিচয় দিও। অবনী হাসল। নীল দড়িতে বাঁধা সন্দেশের বাক্সটা আঙুলে ঘুরোতে ঘুরোতে হাসল।

চোখে হাত দিয়ে জল লুকোল মিনতি। বলল, থাক, আজ থাক।

অবনী অবাক হল। বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, সে কি?

ভিজে গলায় মিনতি তবু হাসবার চেষ্টা করল। গলার স্বর খাটো করে বলল, কতদিন পরে দেখা, ভীষণ মিষ্টিমুখ করতে ইচ্ছা করছে। সত্যি! তার চেয়ে চল ভিক্টোরিয়ায় গিয়ে বসি গে দু'জনে।

সমুদ্র কন্যা

সেমুহূর্তে আমর মনে হয়েছিল একটা বিরাট রহস্য যেন আমার চোখের ওপর ঝুলছে। চোখজোড়া কৌতূহলে আমি তো থ'। কাঠপুতুল। আর বার বার মনে করেছি, এ যদি স্বপ্ন না হয় তাহলে আমি মনোরমা মিত্রকেই দেখছি না?

অবাক হলেন যে? আরো অবাক করে দিয়েছে মনোরমা মিত্র। ওর চোখের ওপর আমার বিস্মিত চোখ তুলে দিয়ে আমি ফুঁ দেওয়া বেলুন সেজেছি। অবাক হলেন যে, অবাক হবার কি আছে?

অত্যন্ত স্বাভাবিক আর নিরুদ্বেগ গলায় আবার চেষ্টা করেছে মনোরমা, জীবনটাকে আমি ত কোনদিন আঁকের মধ্যে আনতে পারিনি, অঙ্ক বলে মেনে নিইনি, তাই আমি অবাক হই না। অবাক হব কেন?

তখনো আমি কাঠপুতুল। আর, আবার আমার চোখের ওপর তাকিয়ে আরো কিছু আশ্বাস আমার চোখে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছে, জীবনে বোধহয়, খানিক বে-হিসেবী হওয়ায় অনেকখানি মাধুর্য আছে। হেসেছে মনোরমা মিত্র। তবুও অবাক হচ্ছেন আপনি? আঁটো-সাটো শরীরের খানিকটা সামনের দিকে বেশ খানিক ঝুঁকিয়ে দিয়ে আশ্চর্য আর দুর্বোধ্য হেসেছে। আর, বারবার সে হাসি আমাকে স্মরণ করাবার চেষ্টা করেছে, এ যদি স্বপ্ন না হয়, তবে এই না সেই মনোরমা মিত্র?

ছবি আঁকা আমার থেমে গেছে কখন। হাতের তুলি হাতে আর অবাক চোখে তাকিয়ে শুধু ভেবেছি, আচ্ছা, এ চোখের সঙ্গে কি এর আগে আমার পরিচয় ছিল? এমনি দুটো আশ্চর্য ডাগর সমুদ্র চোখ এর আগেও কি আমি কোথাও দেখেছিলুম? হাতের তুলিটা ছিনিয়ে নিয়ে কালো রঙ-এ চোবাতে চোবাতে বলেছে, সব অবসরটুকু এমনি করে ছবি এঁকে নষ্ট করেন কেন? কী পান ওতে? শুনুন,

আরো কাছে সরে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুনুন, যে ক'দিন থাকবো এখানে সে-ক'দিন কিন্তু আপনাকে আমি বিরক্ত করে যাব। হাসবার চেষ্টা করেছে মনোরমা মিত্র। সেই সমুদ্র চোখ দুটো আবার আমার চোখে তুলে ধরেছে। তুলিটা শক্ত করে চেপে ধরে বলেছে, এই যে আমি মনোরমা মিত্র, আঁকতে পারেন আমাকে? আমার হৃদয়, আমার ভালবাসা, আমার দুঃখ কি বেদনা আঁকতে পারেন? আঁকুন না! কিন্তু না, পারবেন না। কালির খালি কতকগুলো আঁচড় টেনে টেনে একটা নকল মেয়ের খানিকটা লাবণ্যই হয়ত আঁকতে পারবেন, কি তার মুখশ্রীমায়া খানিকটা হয়ত অপরূপ করে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। কিন্তু পারবেন, তার মনের মণিকোঠায় প্রবেশ করতে? যেখানে ভালবাসা কি বেদনা পাশাপাশি দুটো স্বতন্ত্র দ্বীপ গড়ে তোলে, আপনার তুলি সেখানে পৌঁছতে পারে?

চুপ করেছে মনোরমা মিত্র। ইজেলের পাশে দাঁড়িয়ে ছবিটাকে লক্ষ্য করেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ভেঙে চুরমার করে দিয়ে বলেছে, এই মনোরমা মিত্রও ত কত ছবিই এঁকেছে একদিন। কিন্তু, মনোরমা মিত্র নিজেই শেষ পর্যন্ত অস্তিত্বহীন একটা ছবি হয়ে গেল। তাই না?

আমি বাইরে তাকাবার চেষ্টা করেছি। আর ততক্ষণে নিজেকে জোর করেই পাল্টে ফেলবার চেষ্টা করেছে মনোরমা মিত্র। কী যে ছেলেমানুষ আপনি? হঠাৎ একটা নাটকীয় হাসি ঝলকে ঝলকে ছুড়ে দিয়েছে ছবিটার ওপর। কালো-রঙে তুলিটা চুবিয়ে নিয়ে মোটা মোটা ইচ্ছামত আঁচড় টেনেছে ছবিটার ওপর। কিছু হয়নি। মনের চৌকাট ডিঙিয়ে যারা অন্দরে প্রবেশ করতে পারে না, দুঃখ কি বেদনা যাদের তুলিতে ফোটে না, ফোটে না, সে আবার ছবি হয় কিসে?

সন্ধ্যার মুখোমুখি ও এ-ঘরে ঢুকেছিল, জ্যোৎস্নার মুখোমুখি এখন ও দাঁড়িয়ে। এই কাফেটেরিয়ার দীঘল সবুজ জমিটুকু ছাড়িয়েই পাইনের বন। সারি সারি পাইনের ওই উচ্ছল মাতামাতি আর পাতার প্রতি-

ধ্বনি পেরোলেই দীঘার সমুদ্র-সৈকত। এখন জ্যোৎস্না ঝরছে মুঠোমুঠো পাইনের পাতায়। পাতার মর্মরে। ঘাসের সবুজ আর সৈকতের রূপালী শরীরে শরীরে। নিখাদ জ্যোৎস্না ঢেউএর গলা জড়িয়ে ঢেউএর পিঠে ভাসছে।—জ্যোৎস্নার ছায়ায় পা ফেলে পালিয়ে গেল মনোরমা মিত্র।

পরেরদিন ভোরের মতই ও আবার দরজায় দাঁড়িয়ে। ঘুম-চোখে অবাক তাকিয়েছি আমি। ভোরেই ?

এলাম। চৌকাটের ওপর একটা পা রেখে দরজায় হেলান দিল মনোরমা মিত্র। আমি অবিন্যস্ত চুলগুলোকে দুহাতে সযুত করেছি। আইনমুক্ত রাত্তিরের আলুথালু পা-জামাটাকে আইনমাফিক যথা-স্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বলেছি, ভেতরে আসবেন ত ?

না। দাঁতে দাঁত চেপে আমার ঘুমন্ত ফোলা ফোলা চোখের ওপর চোখ তুলে দরজায় হেলান দিয়ে আরো খানিক দাঁড়িয়ে থেকেছে ও। বলেছে, এমনি সময় না ঘুমিয়ে ভোরে ত সমুদ্রের দিকে বেড়াতে যেতে পারেন ? দেখছেন না ওর গাড়িটা কত ভোরেই আমি ঠেলে নিয়ে চলেছি ?

নাকি ? বিব্রত বোধ করেছি আমি। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছি দু-চাকার ঠেলাগাড়িটার সামনে। আসবেন না ?

উত্তর দিয়েছে মনোরমা মিত্রই। না। ওর যে এখন সময় হয়েছে ফেরবার। ওষুধ খাবেন। আরেকদিন আসবো। কেমন ? দু' চাকার ঠেলাগাড়িটায় হাত রেখেছে মনোরমা মিত্র।

সেই ভালো। আরেকদিন এসে আপনাকে বেশখানিক বিরক্ত করে যাব। এবারে উত্তর দিয়েছেন ওই দু'চাকার ঠেলাগাড়িটা যিনি অধিকার করে বসে আছেন। দীর্ঘাঙ্গী সুপুরুষ, বলিষ্ঠ যুবক। যার মুখের প্রচ্ছদে শুধু তৃপ্তি আর উচ্ছল বিহ্বলতা। যার চোখে প্রসন্নতা এই ভোরের মতই। সমুদ্র ছোঁয়া শীতালু হাওয়া ওর সুন্দর মুখে, ওর চুলে। ওর আয়ত চোখ আর ভুরুর রামধনু জুড়ে। অথচ লোকটা পঙ্গু। কিন্তু কি পরম আত্মতৃপ্তিতে পঙ্গু সুবর্ণ মিত্র বসে আছেন

দু'চাকার ঠেলাগাড়িতে। উজ্জ্বল হাসলেন সুবর্ণ মিত্র। আসবো কিন্তু, অ্যাঁ?

চলি। কাঁধের দিকে ঘাড় বাঁকাল মনোরমা মিত্র। এখন ভোরের হাওয়া ওর বাসি চুলের রাজত্বে। কপাল ডিঙিয়ে ঝুলে পড়া দু' একটা চুল আলতো কানের পাশে কবর দিয়ে ট্রলির হাতলে হাত ছুঁইয়ে বলল,' সকালে ত একটু বেড়ালেই পারেন। একটু বিদ্রুপ যেন কথার ওপর ছিটিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দিল আমার কানের ওপর মনোরমা মিত্র।

আর মনে হয়েছে আমার তক্ষুনি, একটা নিটোল বিস্ময়ের বরফ-ঘরে আমি দাঁড়িয়ে। আরো বিস্ময় আমার চোখে ওই সুবর্ণ মিত্র। একটা জমাট কৌতূহলের খানিকটা ভগ্নাংশ যেন। আর মনোরমা, মনোরমা মিত্র? আমি যেন বরফ-ঘরে।

আরো আশ্চর্য লেগেছিল ওদের ওই নেশাটুকু স্মরণ করে। ওই অথর্ব লোকটাকে টেনে টেনে মনোরমা মিত্র বছরের নটা' মাস নাকি বাইরে-বাইরেই ঘুরে বেড়ান। একরাশ মাংসের স্তূপ ছাড়া যার জীবনে আর কোন অস্তিত্ব নেই, এখন এই মাংসের স্তূপটাই মনোরমার নিত্যসঙ্গী। জীবনের সার্থক সহচর। কি একটা নেশা যেমন মনোরমাকে টানছে, তেমনি মনোরমাও টেনে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে ওই মাংসের স্তূপটা!

পড়ন্ত বিকেলে আবার এসে হাজির মনোরমা মিত্র। কী আঁক-ছিলেন, সমুদ্র না পাইনের বন?

বসুন। ওর একটাও না।

চেয়ারটা শব্দ করে টেনে নিয়ে আমার দীর্ঘশ্বাসের আওতায় ও বসল। আচ্ছা এই দীঘায় আপনি কত বছর?

দু' বছর।

তার আগে!

ঘুরেছি অনেক। উদ্দেশ্যহীন।

শান্তি পেলেন?

আমি তাকিয়েছি মনোরমার চোখে।

কী দেখছেন? নির্বিকার প্রশ্ন করেছে—আমার দীর্ঘশ্বাসের আওতায় বসে মনোরমা মিত্র।

না কিছু না।

আবার সেই সমুদ্রের মত চোখ দুটো আমার চোখে তুলে ধরেছে মনোরমা মিত্র। আর তক্ষুনি আমার আওতায় আমি ওকে দীর্ঘশ্বাসে ছুঁয়েছি।

কেমন বিব্রত আর বিচলিত হয়েছে মনোরমা মিত্র। আর যা-খুশি প্রশ্নে ও আমাকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দিয়েছে। এর-আগে কোথায় ছিলেন?

এই মাস্টারিতেই আরেকটা মফস্বলে।

হঠাৎ এখানে এলেন কেন?

এখানেও মাস্টারিটা পেয়ে গেলাম বলে।

মাস্টারি আপনার ভাল লাগে?

না। ওতে আমার অরুচি

তবে করেন কেন?

কিছু ভাল লাগে না বলে।

ছবি আঁকতে আপনার ভাল লাগে বুঝি?

না, তাও না।

তবে যে আঁকেন সব সময়?

সব কিছুকে ভুলে যাব বলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে আমরাই আওতায় ও আমকে দীর্ঘশ্বাসে ছুঁয়েছে। পাইনের বনে সূর্যের আলো ইতিমধ্যে পাতার আড়ালে লুকিয়েছে। সমুদ্রের ঢেউ অন্ধকারে এখন ডুববে। কলকাতা ছেড়েছেন কতদিন? ও প্রশ্ন করল।

ছ' বছর।

ও চুপ করল। ওর নিশ্বাসে দ্রুততা। সামনের ঘাসের সবুজ ডিঙিয়ে ও পাইনের বনে তাকিয়েছে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস

করব আপনাকে? যেখানে যখন থাকেন, এই রং-তুলি আর ইজেল ক্যানভাস বয়ে বেড়ান ত?

বেড়াই। এই বয়ে বেড়ানোটাই এখন আমার নেশা। একরকম যেন রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে আমার।

আর জানেন, মনোরমা মিত্র মুখ তুলেছে, ওই ঠেলাগাড়িটার মানুষটাও আমার ওমনি রক্ত। আমার হৃদয়, আমার ভালবাসা, যা বলেন, যা সবকিছু। গলাটা কেমন ভিজে ভিজে ঠেকেছে মনোরমার। তাই আজ আপনার মত করে ওকেও আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াই।

চোখ মোছবার চেষ্টা করেছে মনোরমা মিত্র আঁচলে আঙুল ছুঁইয়ে। কেমন যেন হাঁপাচ্ছে ও। সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে ফুলে ফুলে উঠছে। নিশ্বাসের একটা দ্রুত স্পন্দন যেন শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। জানেন, শত চেষ্টা করলেও কি এই বয়ে বেড়ানোর নেশা বাতিল করা যায়? আপনারও যেমন নেশা এইগুলোকে বয়ে বেড়ানো, ওই একই প্রবৃত্তি যে আমার রক্তে। লটবহরের মত ওকেও তাই এমনি করেই আমি বয়ে বেড়াই। রং-তুলির চেয়েও যে ও আমার কাছে আরো বেশী মূল্যবান।

সেই অন্ধকারে হাত ধরতে গেছি আমি। ও হাঁফাচ্ছে। ফুলে ফুলে উঠছে ওর শরীর। বলেছি, এসব আর এখন তুমি মনে কর কেন? সুখ, পেছনের দিন একদিন মরে গিয়ে স্মৃতি হয়। আর স্মৃতিই কাঁদে একাকিনী। কিন্তু আমরা না মানুষ? ভুলতে পারি না এসব? স্মৃতির সঙ্গে গলা জড়িয়ে আমরাও যদি কাঁদতে থাকলাম, মানুষ হিসেবে তাহলে আমাদের অস্তিত্ব কোথায়? ভুলতে পারি না সব?

অনেকখানি হাঁফিয়ে নিজেকে আবার আস্তে আস্তে বদলে নিয়েছে মনোরমা। বলেছে, ও সব আজ কিছু আর ভাবি না। সব আমি ভুলে গেছি।

ভুলে গেছ? সব ভুলে গেছ মনোরমা, ডেকেছি আমি।

হ্যাঁ।

ভুলে গেছ? সব ভুলে গেছ রমা। হাত ধরেছি।

হ্যাঁ।

আমাকে আর মনে পড়ে না?

সব, সব ভুলে গেছি। মাথা নিচু করে বসে আছে ও।

হাত ছেড়ে দিয়েছি আমি।

ও অন্ধকারে মাথা তুলে উঠে দাঁড়িয়েছে সোজা হয়ে। আমি অন্ধকারে ডুবে গেছি। ও অন্ধকারে আমাকে হাত ধরে টেনে সুবর্ণর মত হাত দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে। চলুন, বেড়িয়ে আসি। নিজেকে বদলে নিয়েছে অনেকখানি। বাইরে বেশ মেঘ, না? অন্ধকারে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, তাইত ওকে আজ বের করলাম না। শরীরটাও কেমন আজ আবার ওর ভালো নেই। কিন্তু আমার যে কী ভাল লাগছে? উঃ মেঘ। কী যে ভাল। আপনার?

ভালই।

ও অনেকক্ষণ হাত ছেড়ে দিয়েছে আমার। আচ্ছা, এই দীঘায় কি আছে বলুন ত? শুধু সমুদ্র? আজ যদি চাঁদ উঠতো ওই সমুদ্রের ওপর—আপনাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতাম পাইনের বনে। আরো খানিক উচ্ছল হয়েছে এরই মধ্যে। মখমলের মত কী নরম ওই মাটির ওপর পাইনের মরা-পাতাগুলো, না? কী যে ভাল লাগে না আমার ওর ওপর দিয়ে ছুটে বেড়াতে?

মেঘ গলে গলে বৃষ্টি ঝরেছে তক্ষুনি। সমুদ্র গর্জনের গায়ে বৃষ্টি ঝরছে। পাইনের বড় আরামী নরম শরীরগুলো লাজুক মেয়ের মত ভিজছে। কী যেতেন না? বৃষ্টিতে তাকাল মনোরমা মিত্র। লক্ষ হস্তীর মত অন্ধকার পাইনের লজ্জা-বিনম্র শরীরগুলোর বড় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। আচ্ছা, বৃষ্টিতে ভিজতে আপনার ভাল লাগে না? আমার কিন্তু লাগে। এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এই অন্ধকারে সমুদ্রে গিয়ে দাঁড়াব, কী যে ভাল! চলুন ভিজবেন। মনোরমা আবার হাত ধরল।

না।

কেন? চলুন।

না। বৃষ্টিতে কেউ অন্ধকারে ভিজতে বেরোয় নাকি? কী বলবে লোকে?

বলুক গে। ইচ্ছে আমার তাই ভিজবো। লোকের কী?

আমার ইচ্ছে নেই।

আমি তবে যাচ্ছি।

না, না, মনোরমা যেও না। মনোরমা যেও না। আমি চীৎকার করেছি।

ও এমনি আশ্চর্য। চিরকালই আমার চোখে এমনি বিস্ময়। তাই হোহো করে হেসে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে একটা প্রতিধ্বনি ছুঁড়ে দিয়েছে মনোরমা মিত্র। সেই বৃষ্টিতে পাইনের বনে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে।

বৃষ্টি। বৃষ্টি। বৃষ্টি। পাইনের বনে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে, বায়ু-স্তরে। দীঘল সমুদ্রতীরের শুভ্র ফেনার শরীরে। ঢেউ-এর গর্জনে। বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি। লক্ষ হস্তী ভিজছে। বৃষ্টি। সারা পাইনের বনে বৃষ্টি।

বৃষ্টি থামতেই আমি গেলাম সুবর্ণ মিত্রের 'লাভলি ডেল'-এ। বিছানার ওপর কাত হয়ে শুয়ে একজোড়া নতুন তাস নিয়ে একলা একলাই ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলেছেন। পেসেন্স খেলছেন সুবর্ণ মিত্র। কে, রমা? আরে আপনি? আসুন আসুন, অপ্রত্যাশিত অভ্যর্থনা সুবর্ণ মিত্রের ঠোঁটের ওপর।

কী উজ্জ্বল, প্রশান্ত চোখ সুবর্ণ মিত্রের। স্থির, শুভ্র, প্রশস্ত কপালের ওপর একরাশ প্রসন্নতা ওই সমুদ্রের মত। নতুন তাসগুলোকে একটু দূরে ঠেলে রেখে বললেন শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই। রমা তাই একলাই বেরোলো। ট্রলিত তুলেও শুইয়ে দিয়ে গেছে।

কেমন লাগছে আপনার দীঘা। এই সমুদ্র? আমি প্রশ্ন করেছি।

অপূর্ব। সমুদ্রের দিকে বেশ খানিক স্থির তাকিয়ে নড়েচড়ে

বসবার চেষ্টা করলেন। অপূর্ব। পা-দুটোকে দু' হাত দিয়ে টানবার চেষ্টা করলেন।

কেমন করে বসতে চান বলুন না?

যদি দয়া ক'রে পা-দুটো একটু বাঁদিকে ঘুরিয়ে দেন। আমি সমুদ্র দেখবো। অপূর্ব।

মাটির তৈরী মাছের মতো কাত করে সুবর্ণ মিত্রকে শুইয়ে দিলাম পা-দুটো প্রাণপণে চাগিয়ে ধরে। সুবর্ণ মিত্র প্রশান্ত দৃষ্টিটা সমুদ্রের ওপর ছুড়ে দিলেন। অপূর্ব। নিথর, নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন সমুদ্রে। জানেন, সুবর্ণ মিত্র কথা বললেন, ঠিক এই সমুদ্রের মতো মনে হয় আমার মনোরমাকে। ও আমার সমুদ্র। আর আমি ওর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ।

দীঘার সমুদ্রতটে তাকালেন সুবর্ণ মিত্র। উজ্জ্বল চোখদুটো আরো স্বচ্ছ। আরো খানিক স্থির। কপালের ওপর সমুদ্রের মতোই একরাশ স্নিগ্ধতা। বললেন, সমুদ্রও তো কখনো বিক্ষিপ্ত হয়, এইতো কালই কেমন দীঘা অশান্ত হয়ে উঠেছিল। প্রচণ্ড খেয়ালে উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল হয় না? কিন্তু না, মনোরমা বড় স্থির। বড় শান্ত। ওর সমুদ্রে কোনো আলোড়ন নেই। বড় প্রশান্ত।

সমুদ্র-ছোঁয়া শীতালু হাওয়া ঝলকে ঝলকে ঘরে ঢুকছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়ে দিলেন শীতালু হাওয়ার সমুদ্রে। টকটকে লাল হরতনের বিবিটা টেনে নিয়ে তার ওপর চোখ রেখে বললেন, জানেন ও যদি অমনি স্থির না হয়ে বেশ খানিক অশান্ত হতো তাহলে আরো বেশী খুশী হতাম। ও যদি আমার প্রতিশোধ নিতো, আমি আরো তৃপ্ত হতাম।

বড় স্বাভাবিক আর স্পষ্ট উচ্চারণ করলেন কথাগুলো সুবর্ণ মিত্র। কী মনে হয় জানেন, পুরীর সঙ্গে যেমন দীঘার পার্থক্য তেমনি এই অভিশপ্ত সুবর্ণ মিত্র আর মনোরমা মিত্রে পার্থক্য। এক উত্তাল। আরেক বেশ খানিক স্থির। আমার এই পঙ্গুত্ব বারবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে, একটি বারের জন্যেও ও আমায় ঘৃণা করুক। কিন্তু এই

দীঘার মতোই ওর সমাহিত প্রসন্নতা আমার অশান্ত বিক্ষুব্ধতাকে, বিদ্রোহকে শান্ত করেছে ভালবাসা দিয়ে। ভালবাসা দিয়ে।

হরতনের টকটকে লাল বিবিতে আঙুলের আলত পরশ দিলেন সুবর্ণ মিত্র। আমি ওকে কত ঘৃণা করেছি জানেন? জানেন, এই পৃথিবীর ওপর—অর্থ আমার প্রচুর আছে, প্রচুর ছিল এবং থাকবেও। যা নেই তা হল সুবর্ণ মিত্রের কোমর থেকে নিচের অঙ্গটুকু।

অথচ সুবর্ণ মিত্র বিচলিত নন। বিব্রত নন। স্থির, প্রশান্ত দৃষ্টি দু' চোখের রাজত্বে। কপালজুড়ে স্নিগ্ধ প্রশান্তি। অচঞ্চল দৃষ্টি সমুদ্রে ছড়িয়ে দিলেন। সমুদ্রের গর্জন কান পেতে শুনলেন। বললেন, কিন্তু তাতে কি, তাতে কি?

বেশ খানিক চোখ বন্ধ করে ঢেউ-এর গর্জন শুনলেন। বললেন, জানেন, আমি প্রচুর মদ খাই। একদিন খেয়েছি, এখন খাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও খাব। অথচ সুবর্ণ মিত্র উত্তেজিত কি বিচলিত নন। স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টি চোখের সমুদ্রে আর কপাল জুড়ে একরাশ স্নিগ্ধতা। দেখুন না, ঐসব দেখুন না, হরেক জাতের কেমন সব থরে থরে সাজানো। আমার হাত দুটো খপ করে ছুঁয়ে ফেলে বললেন, দয়া করে আমার পা দুটো চাগিয়ে একটু ঘুরিয়ে দিনতো, আপনার দিকে চেয়ে একটু বসি।

ঠিক কোমর থেকে শিথিল সমস্ত অঙ্গটাকে সন্তর্পণে দুহাতে প্রাণপণে চাগিয়ে ধরে আমার মুখোমুখি বসিয়ে দিলাম সুবর্ণ মিত্রকে ঘুরিয়ে। জানেন, বললেন, যেদিন নিচের অঙ্গটা আপনার মতো সচল ছিল বাগান বাড়িতে রাত তিনেক জেগে মধ্যরাত্রিতে একদিন বাড়ি ফিরে জাগিয়ে তুললাম চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে মনোরমাকে। একটা রক্তালু নেশা আমার চোখে। একটা সর্বনাশের প্রবাহ আমার শিরায় শিরায়।

আমার চোখে তাকালেন সুবর্ণ মিত্র। সুবর্ণ মিত্র বিচলিত কি উত্তেজিত নন। বললেন, শক্ত মুঠোয় চুলগুলো পাকিয়ে ধরেছিলাম। চুলগুলো খালি ফস্কে ফস্কে হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। হাসি

পাচ্ছিল আমার। তাই পেট ঘুলোচ্ছিল। আরো জোরে মুঠোয় জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করেছি, পাশে কেউ নেই, একলা একলা ঘুমোতে এমন ভাল লাগে?

ভয়ে সারা শরীরটা ওর কাঁপছিল থরথর করে। আমার হাসি পাচ্ছিল। পেট ঘুলোচ্ছিল। আর হাত-ফস্কানো চুলগুলোকে আরো জোরে পাকিয়ে পাকিয়ে ধরবার চেষ্টা করছিলাম। ওর চোখ বেয়ে জল পড়ছিল। হাসি পাচ্ছিল। পেট ঘুলিয়ে তাই বমি উঠে আসছিল। এক ঝলক তাজা হুইস্কি ওর গায়ে বমি করে বলেছি, বল, লাগে, একলা একলা এমন, এই এমন শরীর নিয়ে ঘুমোতে ভাল লাগে?

ও সামনে কুঁকড়ে নুয়ে পড়ে যন্ত্রণায় আঁচল টেনেছে। ভয়ে সারা শরীরটা ওর কাঁপছিল থরথর করে। আমার পেট ঘুলিয়ে বমি পাচ্ছিল। খুব হাসি পাচ্ছিল। আর চুলগুলো বারবার খুব হাত ফস্কে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওর চোখ বেয়ে জল নামছিল। তবু সেই আটপৌরে বাঙালী মেয়েদের মতো করে বলবার চেষ্টা করেছে, বল আর কোনদিন মদ খাবে না তুমি?

পেট ঘুলোচ্ছিল। হাসি পাচ্ছিল আর বড়ো ভাল লাগছিল কথাগুলো, থামলে কেন, বল, বড়ো ভাল লাগছে শুনতে, বলে যাও।

বল, খাবে না? তবু মিনতি ওর কণ্ঠে। কেন এতগুলো রাত এমনি করে বাইরে কাটিয়ে আসো। বল, আর যাবে না। কেন, আমি কি মানুষ না? রক্ত-মাংস আমার শরীরে নেই? বল না, নেই, নেই?

আলবৎ আছে।

বল আর যাব না?

যাব।

কেন?

যাব। জোর দিয়ে বলেছি। আলবৎ যাব। যে সমস্ত

রাজকুমার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরতে বেরোতো আস্তাবলে কি তাদের ঘোড়া ছিল না ?

না, যাবে না।

যাব।

কেন যাবে ?

খুশি যাব।

খুশি, যাব। তবে বিয়ে করেছিলে কেন ?

বেশ করেছি ?

বেশ করেছি ? কেন করেছিলে ? কে বলেছিল করতে ? কেন কেন করেছিলে ?

কৈফিয়ত ? এস দিচ্ছি। সারা শরীরে উদ্দাম রক্তস্রোত আরো, উদ্দাম হয়ে উঠেছে সুবর্ণ মিত্রের। কৈফিয়ত ? সেদিন আমার লাম্পট্য প্রবৃত্তি ওর রক্ত-মাংসের শরীরটাকে ফুটবলের চেয়ে অন্য কিছু ভাবতে পারেনি। রক্তের উন্মত্ত নেশা শিরায় শিরায় নাচছে। ও কেঁদেছে। কেঁপেছে। আর তত আমার ক্রোধ ওকে ঘিরে ধরেছে। কপাল কেটে রক্ত ঝরেছে ওর ভুরু ডিঙিয়ে। আঙুলের দাঁত গালের ওপর ছাপ তুলেছে। ইচ্ছামতো শরীরটা ক্ষতবিক্ষত করেছি। লাথি মেরেছি। কিল, চড়, ঘুষি। ও বড় নিঃশব্দে কাঁদছিল। ওর ভুরুর ওপর থেকে রক্ত এসে চোখের জলে মিশছিল। খুব ভাল লাগছিল আমার। যন্ত্রণায় খুব ফুলে ফুলে উঠছিল ওর বুকটা। আর বুকের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল যেন আমি নির্ঘাত কোন প্রখ্যাত যাদুকরের মুখোমুখি বসে ম্যাজিক দেখছি।

একটা আনন্দে ঘরময় পায়চারি করেছি। হোহো করে গলা ছেড়ে হেসেছি। কিন্তু না, ঠিক তার পরমুহূর্তেই একটা অনুশোচনা, একটা যন্ত্রণা আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে গেছি। গাড়িটা বের করে উঠতে যাব—কী হল, কী যে হল জানি না। তিনদিন পরে জ্ঞান ফিরলো নার্সিং হোমে। শহরের সেরা ডাক্তার মনোরমার কানের কাছে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে

বলেছে, জ্ঞান অবিশ্যি ফিরলো, কিন্তু নিচের সমস্ত অঙ্গটাই বুঝি পঙ্গু হয়ে গেল।

আঁতকে উঠলেন সুবর্ণ মিত্র। আপনি, আপনি আরো কাছে সরে আসুন ভাই। পা দুটো আরেকটু ধরে আরেকটু ঘুরিয়ে দিন, দোহাই আপনার। আপনার পায়ে পড়ি। একটু সরে আসুন। আপনাকে একটুখানি জড়িয়ে ধরবো। একটুখানি জড়িয়ে ধরবো। একটুখানি ছুঁয়ে থাকবো।

আমাকে জড়িয়ে ধরলেন সুবর্ণ মিত্র। নিথর। নিস্পন্দ। নিশ্চুপ ঘর। শুধু সমুদ্র-ছোঁয়া হাওয়া আসছে ঘরে। বাইরে সমুদ্র গর্জন। বৃষ্টি থেমেছে। এখন আকাশভরা জ্যোৎস্না। নিশ্চুপ, মুখ গুঁজে আমার বুকের ওপর পড়ে আছে সুবর্ণ মিত্র।

বেশ কিছুক্ষণ ঢলে থেকে মাথা তুললেন সুবর্ণ মিত্র। জানেন, আজ আর কোনো বারণ, কোনো প্রতিবাদ করে না মনোরমা। দেখুন না, দেখুন না, কেমন নিজে হাতেই সাজিয়ে রেখেছে থরে থরে। সেই থেকে কি যে আমায় ভালবাসে, না?

আবার আমার বুকে ঢলে পড়লেন সুবর্ণ মিত্র। দুটো হাত দিয়ে আরো নিবিড় করে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার রক্তস্রোত অনুভব করলেন। সমুদ্রের গর্জন বাইরে। কান রাখলেন। পাইনের বন থেকে কাতর প্রতিধ্বনি সমুদ্রের উচ্ছল ঢেউ-এর ভেতরে হারিয়ে যাচ্ছে। কান পেতে শুনলেন। তারপর কাতর অনুরোধ করলেন, দয়া করে আরেকটু যদি পা-টা ঘুরিয়ে দেন সমুদ্রের দিকে।

জ্যোৎস্নায় যেন সমুদ্রটা আরো কাছে এগিয়ে এসেছে। তরঙ্গ আর গর্জনের ওপর এখন অফুরন্ত জ্যোৎস্না। যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্র। সৈকতের ওপর এখন বালুকণা ব্যর্থপ্রেমিকের নিদারুণ স্মৃতির মতো চকচক করছে। লজ্জা-বিনম্র ফেনার বাসর রাজকুমারীর চোখের মতো। দীঘার সমুদ্র এখন জ্যোৎস্নার সমুদ্র।

আস্তে আস্তে মাথা তুললেন সুবর্ণ মিত্র। বললেন বড় শান্ত, সমাহিত সমুদ্র আমার মনোরমা। ঠিক এই জ্যোৎস্নার মতো

স্নিগ্ধ। এই বিরাট সমুদ্রের মতোই ওর মনটুকু তৃপ্তির তরঙ্গে তরঙ্গায়িত।

চীৎকার করে উঠলেন। দোহাই আপনার, আমাকে কোলে করে ট্রলিতে একটু বসিয়ে দিন। নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে চাগিয়ে তুলে মাংসের পুঁটুলিটাকে গাড়িতে ধপাস করে বসিয়ে দিলাম। দয়া করে একটু বাইরে নিয়ে চলুন। আমি সমুদ্রের কাছে যাবো। মনোরমার কাছে যাবো।

লোকটার কাতর অনুনয় এই ঘরটার চার দেয়ালের গায়ে শিলা-বৃষ্টির মতো। লিকলিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ওষুধভরা একটা ইন্-জেকশনের সিরিঞ্জ তুলে নিলেন। লিভারটা বোধহয় আমার পচে গেছে। একটু স্মিত হাসলেন। তা যাক্ গে, ক্ষতি কি! কিন্তু ব্যথাটা বড়ো যন্ত্রণা দেয়। সে যন্ত্রণা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। আর জানেন, রমা আমার কি ভাল, নিজের হাতে তখন আমায় ঘুম পাড়ায়। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিটা আবার গুটিয়ে নিলেন ঘরের মধ্যে। এতে কি আছে জানেন? মদ নয়, মরফিয়া। আমার মনোরমা এই সিরিঞ্জ হাতে নিলে কতদিন, যীশু-ঈশ্বর-আল্লাকে স্মরণ করেছি, আহা, এই স্বর্গের ঘুম আর যেন না ভাঙে। কিন্তু না, ভালবাসা এমনি জিনিস। সিরিঞ্জ হাতে নিলে কতদিন বলেছি, এইবার প্রতিশোধ নাও মনোরমা। ঘরে কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি। কেউ জানবে না। দরজা বন্ধ কর. ঈশ্বর চোখ বুজোবেন। ওষুধের মাত্রাটা একটু চড়িয়ে আরেকটুখানি বিষ ঢেলে দাও আমার শরীরে। আমি আর জাগবো না।

সমুদ্রে তাকালেন সুবর্ণ মিত্র। ভালবাসা এমনি জিনিস। বুঝলেন, ভালবাসা এমনি জিনিস। কতদিন অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে সিরিঞ্জ হাতে তুলতেই আত্মতৃপ্তিতে ভেবেছি মনোরমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে, আমার সমুদ্রকে এই বুঝি আমার শেষ দেখা। কিন্তু না, পরের দিন চোখ খুলতেই দেখেছি, সমুদ্র ঠিক আমার পাশটিতে বুকের ভেতর এই মাংসের পুঁটুলিটা আঁকড়ে নিয়ে শুয়ে আছে। আচ্ছা, আচ্ছা, বলুন

তো, এ প্রতিহিংসা না ভালবাসা, বলুন তো, ভালবাসা না প্রতিহিংসা?

কী বলব।

বলুন।

কী বলব।

ঠিক তক্ষুণি ও আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছে। আজ কী দেখেছি জানেন? আজ দেখলুম এই ছ' বছর পরে লুকিয়ে লুকিয়ে ও কাঁদছে। আচ্ছা, কেন, কেন বলুন তো?

ট্রলির হাতলে হাত রেখেছি। বলেছি, ঘরের এই বদ্ধ অন্ধকারে সব কথা কি বলা যায়? সমুদ্রে চলুন, বলছি।

কণ্ব মুনির আশ্রম

পরিব্যাপ্ত চেতনা থেকে এক সময় সব ভাবনাগুলো জলাঞ্জলি দিল পরশপতি। ক্ষণবর্ষার মতো এতক্ষণ যে বিপন্ন বোধ তার চেতনাকে ক্ষণিক আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা থেকে মুক্তি পেল এখন। একবার বাইরে তাকাল। কখন পরিচ্ছন্ন বিকেল মরেছে। আর তার চোখের ওপর আকাশের তলায় এবং সামনের টবে চারা বেলকুঁড়ির ওপর শিশির নামার মতো অন্ধকার নামছিল। পরশপতির দৃষ্টিটাকে পরিমিত গাঢ় এবং ঘনীভূত করে তুলল। এবং এক সময় সূর্যের সব আলো মরে গেলে এই অন্ধকার দ্বীপের ভেতর পরশপতি অনুভব করতে পারল, মা কাঁদছেন।

"তুমি কেঁদ না।" যেন দুহাতে এই গাঢ় অন্ধকার ঠেলে পরশপতি আরো কাছে যাবার চেষ্টা করে বলল। পরশপতি মা'র মুখ দেখল না এই অন্ধকারে দেখা যাবে না বলে। শুধু বুঝল, মা কাঁদছেন।

হঠাৎ পরশপতির মনে হল, এই অন্ধকার থাক, মার চোখের ওপর থাক এবং তাহলেই পরশপতি শান্তি পাবে। এই অন্ধকার এক সময় চলে গেলে ঐ মুখটা দেখবে পরশপতি যে মুখটা এ বাড়ির চার চারটি মুখ ঘৃণা করে। বকুল, মল্লিকা, টগর এবং পারিজাত। সব ফুলেরা। এই চার ফুলের চার জোড়া চোখ প্রচণ্ড ঘৃণা করে মায়ের শান্ত এবং স্বচ্ছ চোখ দুটোকে। তাই এ মুহূর্তে পরশপতি অন্ধকার চাইল এবং গাঢ় অন্ধকারে মায়ের প্রশান্ত চোখ দুটোকে অবলীলায় ফাঁকি দিতে পারছে ভেবে শান্তি পেল।

মা সেই অন্ধকারের ভেতর দীর্ঘশ্বাস টানল, পরশপতি বুঝল। এবং এই অন্ধকারে ডুবে পরশপতি স্পষ্ট শুনল, ও ঘরে মল্লিকার গান, টগরের ঘুঙুর এবং পারিজাতের দরকষাকষি। বকুলের শরীর আজ ভাল নেই তাই এ গলির কোথাও বকুলের ছায়া নেই। এ ঘরের এক পাশে পরশপতি কুঁকড়ে শুয়েছিল। মা কাঁদছিল। বকুল ভাঙা

শরীর এবং মন নিয়ে মা'র কান্না শুনছিল। পরশপতি গাঢ় অন্ধকারে ওর ঠোঁট নখ দিয়ে আলতো স্পর্শ করে ডাকল, বকুল।

অন্ধকারে ও পাশ ফিরল। পরশপতি ঠোঁট থেকে নখ তুলে নিল। যেন ওর যন্ত্রণা অনুভব করতে পারল পরশপতি। বলল, খুব কষ্ট হচ্ছে?

না।

পরশপতি লম্বা সাদা আঙুলগুলো বকুলের রুক্ষ চুলের ভেতর চালিয়ে দিল। ডাকল, বকুল—

একটা আশ্চর্য আরাম এবং শেষে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি অনুভব করল এবং সবশেষে যখন নিদারুণ একটা যন্ত্রণা ওকে জড়াল তখন পরশপতি অনুভব করতে পারল ওর সাদা আঙুলগুলো বকুল সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। পরশপতি অনেকখানি সামনের দিকে ঝুঁকল, অন্ধকারে ডাকল, খুব কষ্ট হচ্ছে বকুল?

পরশপতি হাত বোলাল। গলায়। গালে। শেষে পরশপতি হাত কপালে রাখল। "ঘুমোও বকুল"। পরশপতি বলল।

পরশপতির হাতটা আবার কপাল থেকে সংগ্রহ করল বকুল।

তুমি ভাল হয়ে যাবে। পরশপতির স্বর অস্পষ্ট শোনাল। ঘুমোও একটু। পরশপতি বলল। এই তো আমি তোমার গায়ে হাত দিয়ে আছি। তোমার সব যন্ত্রণা এখনি সেরে যাবে। পরশপতির গলার স্বর গাঢ় হল।

কিন্তু যত যন্ত্রণা, যত ভয় তার সবের কারণ ঐ ডাইনী মা'টা। শুধু বকুল কেন, সব ফুলগুলোর শরীর এবং মস্তিষ্ক, বোধ এবং চেতনাকে যেন কুরে কুরে খাচ্ছে এই মহিলাটির আবির্ভাব। বকুল ঘুমোবার ভান করে পরশপতির স্পর্শ চাইল। পরশপতির গায়ে হাত রাখল। এবং সত্যিই এক সময় মল্লিকার গান, টগরের ঘুঙুর এবং পারিজাতের দরকষাকষি ফুরোলে বকুল ঘুমিয়ে পড়ল এই অন্ধকারে।

এই পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার ঠেলে ফেলে পরশপতি যেন অতি কষ্টে

এবার একটা সিগারেট ধরাল। এতক্ষণ মা নীরবে বসেছিলেন। যেন এই স্তব্ধ-প্রহর, অন্ধকার পাতালের এই তিনটি নির্জীব প্রাণীকে নিয়ে সকালের নির্মল আলোর দিকে পৌঁছে দিচ্ছিল। মায়ের চোখ অনুমান করে পরশপতি মার চোখের দিকে তাকাল।

সিগারেট থেকে প্রাণপণে অনেখানি ধোঁয়া তুলে নিয়ে অন্ধকারের ওপর নিজের সামনে কুণ্ডলী রচনা করল পরশপতি। এবং অতি কষ্টে বকুলের ঘুমন্ত শরীর থেকে আঙুল ক'টা তুলে নিয়ে বলল, তারপর ?

"এই হলাম আমরা তিনটি বোন।" মা বললেন। আর সরলা ছিল আমাদের সকলের ছোট। মা চুপ করলেন।

সিগারেট থেকে আবার ধোঁয়া নিল পরশপতি। সেই ম্লান সন্ধ্যালোক যখন এ গলিতে বেঁচে ছিল তখন আকাশে মেঘ ছিল। এখন আকাশে মেঘ নেই। বা হাওয়া নেই। মুখ বাড়িয়ে আকাশ দেখল পরশপতি। তবুও বুঝল, একটু পরেই চাঁদ উঠবে আকাশে। কিন্তু তার আলোক এ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে এখানের কোণঠাসা অন্ধকারের ভেতর পৌঁছবে না। বাইরে গলির মোড়ে দেখতে দেখতে যে নিমের চারা এখন ভর যৌবনের, তার শাখা-প্রশাখা এবং স্বচ্ছপত্র-পল্লব হয়তো প্রহর কয়েক চন্দ্রালোকে ভাসবে। কারণ, পরশপতি বকুলের মুখে শুনেছে ওই পর্যন্ত জ্যোৎস্নায় ভিজে যায়। খুব ফর্সা দেখাবে বাইরেটা। বকুল অনেক দিন দরজার এ-পাশ থেকে বুকটাকে ওদিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে জ্যোৎস্না দেখে। নিমকুঁড়ির ওপর থেকে হাওয়া আসে। দু' একদিন ছুটে গিয়ে গন্ধ নিয়েছে বুকভরে। আর তক্ষুণি সরলামাসী ছুটে এসেছে। "ফের যদি চৌকাঠ ডিঙোবি তো ঝাঁটা খাবি। হল্লা আছে না ? নেকী কোথাকার !"

পুতুলের মতো কাঠ হয়ে গেছে বকুল। সরলামাসীর আটপৌরে দেহটা ঘৃণা এবং প্রতিহিংসায় জ্বলছে। "দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। দিনে রাতে তুলবি তো বড় জোর একটা মিনসে। সরলা-মাসীকে পথে বসাতে আর বাকী রেখেছে কি !" সরলামাসী আরো

জ্বলেছে। "আসবে কি, ঝুলছে তো সব ওদিকে জোড়া জোড়া বেগুন পোড়া!"

কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে অনেকদিন ভেবেছে জ্যোৎস্না এ গলিতে আসে না। নিমফুলের গন্ধ নিয়ে হাওয়া এ-গলিতে এগোতে ভয় পায়। যেমন সরলামাসীকে এ বাড়ির সব ফুলেরা ভয় করে।

কিন্তু সরলামাসীও ভয় করে। ভয়. বড় ভয়, যেমন সব একদিন ফুরিয়ে যায় তেমনি এরাও একদিন ফুরোবে। সরলামাসীর চোখের ওপর দিয়ে এই ফুলগুলো সব একদিন শুকিয়ে যাবে। আরো কাছে গিয়ে নীচু গলায় ডাকে, বকুল—বকুল চোখ তোলে। সাড়া দেয় না।

যাক না, যাক না, সরলামাসী ধরা গলায় বলে। ভয় ভয় চোখে বকুলের চোখে তাকায়। বলে, যৌবন জানবি জোয়ারের মতো। যত-দিন দেহে জোয়ার আছে, ততদিন তোদের কদর আছে। ব্যাস! ভাঁটা তো সব ফুরল। এক পুরুষে মজিস না, তিন পুরুষ চলবে কি করে?

দেখে, বকুল অবাক চোখে দেখে সরলামাসীর চোখ, ভুরু আর কপালে, ওর পর পর তিনটে শিরা ফুলে আছে। ভয় করে। সবাই ভয় করে অই চোখ দুটোকে। যেমন জ্যোৎস্না এ বাড়ির চৌকাঠে ঘেঁসে না।

বকুল, ডাকে সরলামাসী।

তাকায় বকুল. বল।

বুঝবি তখন। জোয়ার ফুরলে বুঝবি তখন, এই সরলামাসী কত তখন আপনার জন। চুনবালিখসা দেওয়ালে তাকিয়ে সরলামাসী মুহূর্তখানেক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে গায়ে হাত রাখে। ডাকে, বকুল—

বল। বকুল তাকায়।

কারোকে ভালবাসিস না রে!

আকাশে মেঘ ছিল না। বা হাওয়া ছিল না। একটা গুমোট অস্বস্তি এই ঘরখানার সমস্ত স্বচ্ছন্দটুকু জল্লাদের মতো গ্রাস করে লক্ষহস্তীর কৃষ্ণবর্ণ শুঁড়ের মতো এগিয়ে আসছিল। মা এতক্ষণ ধরে

সরলামাসীর গল্প শেষ করে বললেন, এবারে আমার গল্প বলি শোন।

এই প্রচণ্ড অস্বস্তির ভেতর পরশপতির শিরা, স্নায়ু এবং রক্তস্রোত নিষ্কৃতি চাইছিল। হাওয়া চাইছিল। অন্ধকারে বকুলের শরীর স্পর্শ করে একটা আশ্চর্য তৃপ্তি খুঁজে পেল। অথচ এই ক্ষণ-ছলনার আবর্তের ভেতর সমস্ত শিরা শিথিল এবং বোধ অবশ হয়ে আসছিল।

এ-ঘরে খুব বেশী দিন নয় পরশপতি এসেছে। এবং যখন এসেছিল তখন কোনো জাগ্রত বোধ নিয়ে নয়। নিরলস কামনাকে সঙ্গে করে নয় কিম্বা কোনো চরম অসঙ্গতির মিল খুঁজতেও পরশপতি আসেনি। তবু এসেছিল। যখন এই পৃথিবীর ওপর নিজের পদধ্বনিকে মৃত্যুর পদধ্বনি বলে ভুল করেছিল। কিন্তু এসেও শান্তি পায়নি। বারবার স্ত্রীর মুখ মনে পড়েছে। সামাজিক সুস্থতা, রুচি এবং শিক্ষাকে : কি আশ্চর্য অবহেলায় কাচের বাসনের মতো টুকরো করে দিয়ে চলে গেল পরপুরুষের কাছে। শান্তি চাইছিল পরশপতি। সুখ চাইল। এবং যখন সুখের নেশায় অন্যপথের ফিকিরে ছিল, মুক্তি চাইছিল, এমন এক লোকালয়ে আশ্রয় খুঁজছিল, যেখানে লোভ নেই, হিংসা নেই, সব কামনা-বাসনা বিবর্জিত, ছলনা নেই—ঠিক সে মুহূর্তে পরশপতির মনে হল বকুলের চোখে ছলনা নেই!

পরশপতি থেকে গেল সেই থেকে কাণাগলিতে। এই বেশ্যালয়ে। সারাদিনের কর্মচঞ্চলতার অন্তিমে ঠিক মনে পড়ত এই ছলনাহীন চোখ দুটো। নিজের বোধ, শিক্ষা এবং বংশক্রম নিয়মিত নিষ্ঠুর পরিহাসে নিশ্চিহ্ন করে বকুলকে ভেঙেচুরে নিজের হাতে গড়তে চাইল।

সরলামাসী রাগতো, ভীষণ রাগতো। বলতো, লোকটাকে মদ খাওয়া শেখাতে পারিস না? মদে মেজাজে মজিয়ে রাখিস, ছাড়িস না।

একটুকাল চুপ করে থেকে আবার বলত, কিরে পারিস না?

পারি। বকুল বলে।

তবে শেখাস না কেন? তবু তো দুটো পয়সা আসে।

শেখাব। বকুল চুপ করে।

বড় ভয়ে ভয়ে তাকায় সরলামাসী। ভয়ে ভয়ে ডাকে, বকুল—

চোখ তোলে বকুল।

মাসী তার ভয়ঙ্কর চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলে বলে, যেন ভালবাসিস না রে।

আকাশ দেখে বকুল। তবু বড় ভয় করে।

সরলামাসী বলে, নিবি আজ এক বোতল? ডাকব রাস্নুকে।

নেবখ'ন।

কর্কশ গলায় সরলামাসী বিকৃত উচ্চারণ করে, নেবখ'ন।

বকুল আকাশে তাকায়। ঘর আর ঘর। তবু ঘরের মাঝখানে উন্মুক্ত ফালিটুকুর ভেতর দিয়ে নারকোল গাছের পাতার ওপর কিছু জ্বলন্ত নক্ষত্র দেখা যায়। আর তাকালেই যেন সরলামাসীর চোখ পাহারা রেখেছে মনে হয়।

অন্ধকারে প্রচণ্ড অস্বস্তির ভেতর দীর্ঘশ্বাস ফেলল পরশপতি। মা বললেন, শুনলে ত আমার গল্প?

দুই

সরলামাসী তখনো মৃত্যুশয্যায়। কোমরের নিচে থেকে সবটুকু পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গেছে। সময় অসময়ে রাস্নু এসে পাশে বসে। সান্ত্বনা দেয়, তুমি সেরে উঠবে মাসী।

মাসী পাশ ফেরবার চেষ্টা করে। পারে না। রাস্নু পাশ ফেরাবার চেষ্টা করে। পারে না। মাসী বলে, ওগুলো খুব ফাঁকি দিচ্ছে না রে?

না। রাস্নু ঘাড় নাড়ে।

ওরা সব পথ খুঁজছে না রে?

রাস্নু চুপ করে।

মাসী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।

কী জানি? রাস্নু উত্তর দেয়। তারপর বলে, কে আর এ পথ ভালবাসে মাসী?

অসহায় অঙ্গটা দেখে মাসী। বলে, আমি শুয়ে শুয়ে সব লক্ষ করি। একবার যদি দাঁড়াতে পারি, ছাদে আমি ত্রিপল তুলে দেব। ছাদে উঠে আকাশ দেখা বের করে দেব। রাসু—

রাসু মাথা দোলায়। বল না—

দেখিস রে, দরজা যেন বন্ধ থাকে না।

রাসু আশ্বাস দেয়। না, তা থাকবে কেন? মানুষ নাড়াচাড়া করে তবে না দুটো পয়সা। খদ্দের লক্ষ্মী।

তবুও এ পঙ্গু শরীরটাকে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। গলার স্বর ক্রমশ ক্ষীণতর হয়ে এলে মাসী কাঁসর রাখল পাশে। কাঁসি পেটাত। আর একে একে সব সামনে এসে দাঁড়াত। বিছানার পাশে ফুল ফুটত। বকুল, মল্লিকা, টগর, পারিজাত।

ক্ষীণ কণ্ঠে মাসী ডাকত, পারিজাত।

কপালে হাত রাখত পারিজাত।

তাকাত সরলামাসী। চোখের ভেতর পাতি পাতি করে কী যেন খুঁজত। বলত, আর ভাল লাগে না, টপ্পাটা এট্টু ধর।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে শোনে সরলামাসী। চোখের ভেতর থেকে জল গড়িয়ে আসে। বলে, গাইবি, নাচবি, মদে মেজাজে মজে ফুর্তি করবি। যদি একবার দাঁড়াতে পারি রে!

বকুল এসে চোখের জল মুছিয়ে দেয়। ক্ষীণ হাতটা অনেক কষ্টে বকুলের হাতে তুলে দেয় সরলামাসী। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলে, দিস সব, শুধু মন দিস না। শুয়ে শুয়ে শাশ্বতীকে মনে পড়ে। সেই কিনা আজ সরলামাসী।

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে পেটটা অনেকখানি ফুলে উঠল। বকুল লক্ষ্য করল। ক্ষীণকণ্ঠে বলে, কিছুই থাকে না চিরদিন, যা থাকে তা শুধু জ্বালা। যেন উঠে বসবার চেষ্টা করল সরলামাসী। শুধু জ্বালা রে বকুল!

বকুল গলার নিচে হাত বোলাল। বলল, কেঁদ না।

কিন্তু তবু ভাবনা। বকুলের হাতটা আবার জড়িয়ে ধরে সরলা-মাসী। কই টগর-কে তো দেখছি না? মরেও আমার শান্তি নেই।

টগর গায়ে হাত রাখে।

একটা হাত টগরের দিকে বাড়িয়ে দেয় সরলামাসী। বলে, কই ক'দিন তো তোর ঘুঙুর শুনছি না?

তোমার অসুখ যে—

তাতে কি! যেন সকলের চোখে তাকিয়ে কী যেন খুঁজল। দীর্ঘশ্বাস টানল। ঘোলাটে চোখ দুটোয় গোটা পৃথিবীর সবটুকু, সমস্তটুকু, যেন দেখতে চাইল। ককিয়ে ককিয়ে বলল, দরজা যেন বন্ধ রাখিস না। মাসী ফুরিয়ে গেল।

শেষ বিকেলের ম্লানালোকে যখন পাতি পাতি করে খোঁজবার চেষ্টা করছিল সব ফুলগুলোকে সরলামাসী তখন বকুল, মল্লিকা, টগর এবং পারিজাত এত তাড়াতাড়ি সরলামাসী ফুরিয়ে যাবে ভাবতে পারেনি! যখন জানল, সরলামাসী আর নেই, সেই সরলামাসীর হিংস্র চোখ আর কটু ভাষা নেই, ফুলগুলো দরজায় না দাঁড়ালে গালাগাল করবে না, কি কেউ আকাশের নক্ষত্র দেখলে, নিমফুলের গন্ধ বুক ভরে টানলে সরলামাসী আর ছুটে আসবে না তখন, অন্তত তখন এই বোধ এদের চোখে প্রতিফলিত হল, সরলামাসীর বিদায়ের এই বিষণ্ণ অবস্থাটাকে কাটিয়ে সবাই খুব আনন্দ করবে।

আজ সারা রাত সবাই খুব স্ফূর্তি করবে ঠিক করল। নেশা করবে। এবং এই বিষণ্ণ আকাশ নির্মল হলে জ্যোৎস্না উঠবে। তখন কেউ ছাদে গিয়ে দাঁড়াবে। আকাশ দেখবে। নির্মল, নির্মেঘ আকাশ। নিমের কুঁড়ি থেকে যদি গন্ধ আসে নারকোল পাতার হিজিবিজি পার হয়ে, তবে চুপচাপ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ঠিক করল। চোখ বুজিয়ে থাকবে।

রসকলি বাউল কিম্বা রাধা নামের দোহাই দিয়ে সরলামাসীর লোক মজানো টপ্পা নয়—পুরোপুরি হিন্দী গানের কেরামতি গুনগুনিয়ে

উঠল পারিজাতের ঠোঁটে। আর ছাদে উঠতে গিয়ে দাঁড়াল বকুল। কারণ, রাসু ডাকল, বকুলকুঁড়ি মা এসেছে।

মা এলেন। সরলামাসীর অন্তিম ইচ্ছাটুকু রাসু বয়ে নিয়ে গিয়েছিল ব্যাণ্ডেলে। চার্চের পাশের রেসক্যু হোমের বোনকে আনতে। আর ওরা সবাই দেখতে ছুটে এল। এই সুন্দর এবং সৌম্য মূর্তিকে দেখে সবাই অবাক হল। উনি শান্ত গলায় বললেন, তোমরা সবাই কিন্তু আমার মেয়ে আজ থেকে। রাসুকে তাই ব্যাণ্ডেলে মা ডাকতে শিখিয়েছি।

মা মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করলেন। তুমি?

আমি পারিজাত। আমার গলার খুব কদর আছে এ-গলিতে। পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করল মাকে পারিজাত। বলল, সরলামাসী আদর করে আমাকে ডাকত পরী বলে।

খুব ভাল। মা মৃদু হাসলেন। ডাকবেই তো। তারপর বললেন, তুমি?

আমি? হি হি করে বেশ কিছুক্ষণ হেসে বলল, আমি বাইজী টগর। নমস্কার করে বলল, গলিতে বলে টগরবালা।

সরলামাসী তোমায় খুব ভালবাসতেন, না? মা শান্ত চোখ ওর চোখে তুলে ধরলেন। বেশ, তুমি?

মল্লিকা। মল্লিকা হাত তুলে নমস্কার করে বলল, এখন আর আমি লোক নিই না, আর্ট কলেজে মডেলের কাজ করি। টগর ঠোঁট টিপে হাসল। রসিকতা করল, মাসী ওকে আদর করে বলত, কলকে ফুল।

না। বলবে না। মা শুভ্র হাতে ওর চিবুক স্পর্শ করলেন। বললেন, ভাল কর। আর তুমি গো?

লাজুক চোখে বকুল তাকাল। বলল, গলিতে নাম বকুল। এবারে স্কুল ফাইনাল দিয়েছিলাম। পাশ করিনি। আসল নাম বীথি। বীথি সেন। আপনি আমায় যা খুশী বলে ডাকবেন। প্রণাম করল পায়ে হাত ছুঁইয়ে বকুল।

তোমাদের সবাইয়ের আজ থেকে কিন্তু আমি মা। যেন এই অধিকারটুকু আদায়ের সুরে উচ্চারণ করলেন তিনি।

দেখতে দেখতে হঠাৎ একদিন বর্ষা হল। প্রচুর মেঘ করল সকাল থেকে। সেই মেঘ অন্ধকার করে রাখল পথঘাট এবং সেই অন্ধকারে সারাদিন এ-গলিটা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকল। তারপর বৃষ্টি এল বিকেলে। আর সন্ধ্যার মুখে প্রচণ্ড এবং বীভৎস শব্দ করে নারকেল গাছের মাথায় বাজ পড়ল। এ বাড়ির চারটি ফুল সেই বজ্রপাতের রেশ স্পষ্ট অনুভব করতে পারল। মা বললেন, এই পবিত্র আগুনে তোমরা পবিত্র হলে। আজ থেকে তোমরা কারো পরাধীন নও।

এ বাড়িটা যখন পবিত্র হল, তখন সবাইকে মা সামনে ডাকলেন। বললেন, তোমাদের যত ভাবনা তা সব আজ থেকে আমার। তোমরা মুক্ত। আর সেদিন মা পরশপতিকে আঘাত দিলেন। বকুলকে কাঁদালেন। মা কাঁদলেন। তারপর ভোরে নিজে হাতে দরজা খুলে দিয়ে নিজে হাতে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বকুল শুয়ে শুয়ে শুনল, পরশপতি চলে গেল। তারপর বৃষ্টির জল তিনদিন পরে এ গলি থেকে সরে গেল। যেন এ বাড়ির সব মলিনতা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল।

সকলকে মা ডাকলেন। পরিষ্কার আকাশ। বাড়িটা বড় পবিত্র বলে মনে হচ্ছিল সকলের। মা বললেন, তোমরা সুখ রচনা কর। ওরা সুখের সন্ধানে প্রবৃত্ত হল। ওরা হাসল প্রাণ খুলে। চাঁদ দেখল। নিমফুলের গন্ধ নিল। এবং যথারীতি আধুনিক গান ধরল।

উঁহু ও গান নয়। যেন এ বাড়ির পবিত্রতা রক্ষা করলেন মা।

সেই আগুনে পবিত্র হবার পর থেকে সামনের দরজায় খিল তোলা থাকে সন্ধ্যায়। এ বাড়ি পবিত্র এবং তাই রাসু চুপি চুপি উঁকি-ঝুকি দেয় জানালা দরজার ফুটো ফাটায়। বলে, লায়েববাবু বেলফুলের জোড়া গড়ে এনেছে।

আর তখুনি পারিজাতের ঠোঁট কাঁপে। সরলামাসীর সযত্নে

শেখান রসকলি বাউল কিম্বা রাধানামের দোহাই দিয়ে মন মজানো টপ্পা বড় খাঁটি সুরে মনে পড়ে। মা হাঁকেন, পারিজাত—

পারিজাত ইশারা করে রাসুকে সরে যেতে বলে। বলুন—

তোমাকে যে মীরার ভজনের প্রথম পাঠ দিয়েছিলাম তুলছে?

না। ধরা গলায় অপরাধীর মত উত্তর দেয় পারিজাত।

আগে তানপুরা নামিয়ে নিয়ে বসো। আসছি আমি।

টগর। ডাকেন মা। টগর।

এই যে আমি।

বলেছি না সন্ধ্যা হলে রাস্তার জানালা বন্ধ করে দেবে। বলিনি? দ্বিতীয় ভাগের বানানগুলো হয়েছে? কী চুপ করে যে?

না।

না আর না। খালি না। মা ধমকান। সব্বাইকে আমি মাত্র একঘণ্টা করে সময় দিলাম। বকুল, বকুল—

বকুল সামনে এসে দাঁড়ায়।

কী, কাঁদছিলে?

চোখ মোছে বকুল। না।

তবে করছিলে কী? মা'র ভুরু ওপরে ওঠে। তোমাকে যে নোট লিখে দিয়েছি মুখস্থ করেছ? আর ক'দিন আছে পরীক্ষার? গলা আরো ওপরে তোলেন মা। মল্লিকা—

ছুটে আসে মল্লিকা।

উলের যে প্যাটার্নটা দিয়েছিলাম মনে আছে?

আছে।

গলাটা কী করে তুলতে হবে আজ শিখে নিতে বলেছিলাম না?

আজ সন্ধ্যা থেকে শীতল হাওয়া এসে যেন গাঢ় অন্ধকারকে খুব তরল করে দিচ্ছিল। মা হাওয়ায় দীর্ঘ করে নিঃশ্বাস নিয়ে বলে:

সেই থেকে এ-বাড়ি পবিত্র। বজ্রের আগুনে এর কালিমা স-অ-ব পুড়ে গেছে। এই তপোবনে তোরা সুখ রচনা কর। সুখী হ।

[illegible]ফুলের পালা বন্ধ দরজার ওপাশে ঢেঁকে গেল। দীর্ঘশ্বাস এবং তৃষিত পবনের দরজার ওপাশে কত হাওয়ায় মেলান।

মা স্নেহে গলা ভিজিয়ে ডাকলেন, তোমরা এবার খাবে এস। ওরা একে একে মার সামনে এসে দাঁড়াল। মা পরম যত্নে খাবার দিলেন, রাবড়ী, ক্ষীরকদম্ব, ছানার পোলাও। বললেন, আর নাও পরমান্ন।

চারফুল তৃপ্তি করে প্রচুর খেল। পেট ভরে খেল পরমান্ন। ঝর্ণার জলে যে স্বচ্ছতা, ওদের চোখের ভেতর সেই স্বচ্ছতা ফুটল। মা তৃপ্ত হলেন। বললেন, কয় বোনে এবার আমার সঙ্গে এস।

ওরা স্বস্তির ঢেঁকুর তুলল এবং পরম কৌতূহলে মা'র সঙ্গে এসে এ ঘরে দাঁড়াল। সরলামাসীর ঘর। মা এ ঘরে ভগবান যীশুর ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি রেখেছেন। সন্ধ্যা হলেই মোটা মোটা মোমবাতি যীশুর ছায়ার ওপর জ্বেলে দেন। পবিত্র আলোকে এ ঘর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

সেই উজ্জ্বল পবিত্র আলোয় ওরা মা'র সামনে দাঁড়াল। মা সরলামাসীর আজীবন সঞ্চয় ওদের সামনে উন্মুক্ত করলেন। পুরোনো সিন্দুকের ভারী লোহার ডালা খুলে দিলেন। ওরা চমকে উঠল। সরলামাসীর সঞ্চয়। অর্থ। আভরণ।

মা সেই অলোকে সরলামাসীর আজীবন সঞ্চয় অপচয় করলেন। চার ফুলকে সমান করে সব গয়না ভাগ করে দিলেন। তোরা সুখী হ।

ঘরের ভেতর মোমবাতির উজ্জ্বল ছায়া কাঁপছিল। সেই আলোয় মা'র লম্বমান ছায়া দ্বিতীয় সিন্দুকে পড়ল। মা দ্বিতীয় সিন্দুকের ডালা খুললেন। বললেন, তোরা হেঁট হয়ে ছাখ, এই হল সরলামাসীর সঞ্চয়। মা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। বাতির ছায়ায় মা'র ছায়া নড়ল। মা বললেন, আমি হিসেব করে দেখেছি, সারাজীবন তোদের হেসে খেলে এতে চলে যাবে। সব দুঃখ আমার জন্যে তুলে রাখ। তোরা সুখ রচনা কর। এ অর্থ সবটাই তোদের।

উদ্ভাসিত হল। ওদের ভুরু কাঁপল। মা সেই আলোকে ওদের পবিত্র মুখশ্রী দেখলেন। আদর করে মা বললেন, তোদের দেখতে আরো সুন্দর হয়েছে।

সরলামাসীর আজীবন সঞ্চয়ে ওরা আজ খুশী মত জানালা দিয়ে ফুল কিনল। সরলামাসীর আজীবন সঞ্চয় এই প্রথম ওরা ইচ্ছামত অপচয় করল। ওরা সাজল এবং স্বর্ণাভরণে সুন্দরতর হল। তারপর যে যার ঘরে গিয়ে নিজেদের নতুন রূপ দেখল। পবিত্র রূপ। কেউ আনন্দের ভেতর 'নোট' মুখস্থ বলল। কলেজের স্বপ্ন দেখল। কেউ মীরার ভজনে সুরের কোমল স্পর্শ দিল। কেউ উলের কাঁটা হাতে নিল এবং কেউ ভাবল, তার এই পবিত্র দেহ এ মুহূর্তে পবিত্র পরিবারের কন্যার চেয়ে মনোহর।

ওরা এবার জড়াজড়ি করে চার বোনে ছাদে গেল। জ্যোৎস্না আছে। হাওয়া আছে। নক্ষত্রের সাদা আলো ছাদটার অনেকখানি ভিজিয়েছে। আকাশে চারবোনে এক সঙ্গে তাকাল। আর তাকাতেই কেমন অন্যদিনের চাইতে আজকের আকাশটা অনেকখানি উঁচু বলে মনে হল।

ওরা এবার স্তব্ধ হল। চোখ নামাল। তারপর ত্রস্তপদে জড়াজড়ি করে চার বোন নিচে নেমে এল। চার বোন একসঙ্গে ডাকল, মা—

মা সেই আলোয় ওদের পবিত্র চেহারাগুলো দেখলেন। "বল"। ওদের গলার মিনতি লক্ষ করলেন মা।

সন্ধ্যা ফুরোল। আজ একটু একদিনের জন্যে দরজাটা খুলে দেবে মা?

লোকটা

বিকেলের আলো মরে গেলে সন্ধ্যা নামল। আবছা অন্ধকারের ভেতর তেমনিভাবে বসে থাকল সুমনা। ঠিক এমনিভাবেই বসে বসে একটু আগের গোধূলি দেখেছে বাইরে। দেখতে দেখতে সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতা থেকে সূর্যের শেষ রং মরে যেতে দেখেছে চোখের ওপর। অন্ধকারে সব এখন একাকার। অস্পষ্ট, আবছা আলো দেখতে দেখতে চোখের ওপর নেমে এল, সব অন্ধকারে ডুবে গেল। সেই কখন থেকে তেমনি আগোছালো, তেমনি ভাবনার ভেতর ডুবে রইল সুমনা। ইচ্ছা হয়েছিল একবার আলো জ্বালে, কিন্তু জ্বালল না। জ্বাললেই যেন মনে হয় সে আসছে।

সুমনা ভয় করে লোকটাকে। কেন ভয়, কিসের ভয়, অত বোঝে না সুমনা। কিন্তু ভয় করে। অল্পদিনের সান্নিধ্যে বুঝেছে সুমনা, লোকটা কেমন অদ্ভুত। কী চায় এই পৃথিবীতে, কিসে খুশী হয়, কেনই বা ঘৃণা করে এ বাড়িটাকে, এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে অনেক সময় ব্যয় করেছে সুমনা, উত্তর খুঁজছে। কিন্তু—

কিন্তু হঠাৎ এখন চমকে উঠল সুমনা। সিঁড়ির ওপর পদশব্দ শুনে চকিতে আলো জ্বালল সুমনা। নিজেকে একটু গোছালো করল, তারপর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকল। কিন্তু না, কেউ এল না। কেউ ঘরে ঢুকল না। সেই-দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ সুপুরুষ লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়াল না।

তখন সুমনা আবার ভাবল তার স্মৃতিকে। তার কথাগুলোকে। মাত্র অল্পদিনের বন্ধুত্ব সুমনার সঙ্গে। বরং আলাপই বলা চলে। এই অল্পদিনের সান্নিধ্যে একদিন কেন জানি, অত্যন্ত তাচ্ছিল্যে নিজের অভিমত প্রকাশ করে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলল লোকটা। কিন্তু নিষ্কৃতি দিল না। যদিও বড় একটা আর আসে না এ-বাড়িতে, কিন্তু অই—

যেখানেই সুমনা, ঠিক যেন ছায়ায় ছায়ায় সেখানে গিয়ে হাজির। সুমনা আবার ভাবল লোকটাকে। লোকটার কথাগুলোকে—"কাপুরুষ আমি নই, মহাপুরুষও, কিন্তু রঙিন মুখোশ আমার আবরণ নয়। তাই বাইরে অন্তরে আমি এক। তোমাদের মতো মেয়েদের হেফাজাত এই নরককুণ্ডের কাছে ভালবাসার জন্য দ্বারস্থ হওয়ার চাইতে ভালবাসাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে আমার কোন দ্বিধা নাই।"

এবার সত্যিই পদশব্দে চমকাল সুমনা। ভারি জুতোর উদ্ধত আওয়াজ ওপরে উঠে আসছে। যেন কুঁকড়ে গেল সুমনা। ভয়ে কাঠ। কিন্তু না, কেউ এল না। পদশব্দ একেবারে এবারে ওপরে উঠে সুমনার সামনে এসে দাঁড়াল। সুমনা চোখ তুলে তাকাল, বিনয়। সুমনা স্বস্তির নিশ্বাস নিল। মুখ বুজে বেশ একটু ভাবল। ভেবে একমুখ হেসে ফেলে বলল,—সেই কখন থেকে বসে আছি, আর—এই বুঝি আসার সময় হল?

বিনয় কৌতুকের সুরে বলল,—ভীষণ অপরাধ করে ফেলেছি। তারপর একটা চেয়ার টেনে সুমনার মুখোমুখি বসতে বসতে বলল, কী করব বল? তোমার ভাষায়, তোমার সেই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

আবার কুঁকড়ে গেল সুমনা। হাত বাড়িয়ে পদশব্দের সঙ্গে সঙ্গে আলোটা জ্বেলেছিল আগেই, এখন উঠে গিয়ে পাখার গতিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—কোথায় দেখা হল?

বিনয় আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরাল। ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া টেনে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে বলল, ওই তো মোড়েই। বিনয় এখন সুমনার চোখে অপলক তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখল, কী যেন খুঁজল চোখের ভেতর। তারপর নিতান্ত প্রসঙ্গচ্ছলে বলল, —আমাকে আসতে দেখে মোড়ের চা-এর দোকান থেকে বেরিয়ে এসে হটাৎ হাত ধরে সে কী হাসি! হেসে-টেসে বলল,—আসুন না, চা খাই একটু।

খেলে? সুমনা গলার ভেতর সমস্ত কৌতূহল চেপে রেখে ওই

টুকু শুধু উচ্চারণ করল।—কী করি বলো? বিনয় একটু নড়েচড়ে বসে আবার সিগারেট টানল। বলল,—হাজার হোক তোমার বন্ধু তো. প্রত্যাখ্যান করি কী করে?

সুমনা চুপকরে থাকলে বিনয় বলল,—তারপর একসময় লোকটাই বলল, যান যান মশাই, অনেকক্ষণ কথায় কথায় আটকে রেখেছি। আপনার আবার প্রিয়মিলনে দেরি হয়ে যাচ্ছে। পরে আমাকেই আবার দোষারোপ করবেন।

সুমনা নিতান্ত তাচ্ছিল্যে বলল—ওঃ।

বিনয় উঠে দাঁড়াল। চোখের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আরো কাছে সরে এল। ওর কপাল, চোখের ভেতর, গলার নিচেটা লক্ষ্য করে বলল,—কী বেরোবে না?

সুমনা দরাজ গলায় হেসে সব কিছু অবলীলায় যেন গোপন করে বলল,—রাজাবাদশার হুকুম যখন, না বেরিয়ে পারি। তেমনি কপালে আর চোখে উজ্জলতা সাজিয়ে রেখে বলল,—একট বোসো, তৈরী হয়ে নি। ও-ঘরে যেতে যেতে সুমনা বলল,—ভয় নেই বেশীক্ষণ ভোগাব না, আসছি।

গলির মোড়ে এসে সুমনা বলল,—এবারে দেখা হলে আর যেন কথা বোলো না। অযথা এত সময় নষ্ট করেছ, এর পর দেখা হলে পুরো সন্ধ্যাটাই মাটি হয়ে যাবে।

বিনয় পাশাপাশি ঘন হয়ে হাঁটছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, তুমি ওকে ভয় পাও কেন? হাজার হোক মানুষ তো। বাঘ ভালুক হলে না হয় কথা ছিল।

ভয়? সুমনা তেমনি তাচ্ছিল্যে উচ্চারণ করল,—ভয়? কিসের ভয়?

আবার হাঁটল বিনয়। ওর সঙ্গে তোমার তো একসময় বন্ধুত্ব ছিল।

ছিল।

হঠাৎ তবে ঘৃণা কর কেন? বিনয় যেন উত্তর খুঁজে না পেয়ে

ওইটুকু প্রশ্ন করে বসল। তোমার বন্ধুদের ভেতর ও তো খুব কৃতী পুরুষ। আগে আগে তুমিই তো কত গল্প করেছ। কত প্রশংসা করেছ। বিনয় ওইটুকু বলে কথায় কথায় মোড়টা এবং মোড়ের মাথায় কৃষ্ণচূড়াগাছের ছায়া পার হয়ে এল। না, লোকটা নেই। লোকটা এল না।

রাত দশটার কাছাকাছি বাড়ি ফিরে সুমনা দেখল, মা তখনো ফেরেনি। মা ফেরেন আরো পরে, হয়তো এ পাড়া আরো নিঝুম হয়ে গেলে। কিংবা ফেরেন না কোন-কোনদিন। কেন ফেরেন না, কেন রাত করে ফেরেন, এ নিয়ে কোন তর্ক নেই, কোন বচসা নেই, এটা নিয়মের ভেতর দাঁড়িয়ে গেছে। একজন লোক এ বাড়িতে আছেন। মধ্যবয়সী পুরুষ, মার বন্ধু। মা ওঁকে আপ্যায়ন করেন। লক্ষ্য করেছে সুমনা, ওঁর কাছে বাধা কুকুরের মতো মাকে বসে থাকতে হয়। ল্যাজ নাড়তে হয় সময়ে অসময়ে। এসব কেমন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে।

মা'র এই বন্ধুর সঙ্গে বাবা বেড়াতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি। সেই থেকে এ-বাড়ির ভালমন্দ, এ-বাড়ির তদারকি উনিই করেন। মা-এর তাতে দ্বিধা নেই। মা'র ইচ্ছাকে ছাপিয়ে এ-বাড়ির সমস্ত ইচ্ছাকে ছাপিয়ে ওঁর আবহসংগীত বাজে। মাকে, সুমনাকে, অবলীলায় শুনতে হয়। তারিফ করতে হয়। নাকি মা'র ভাষায় বাঁচতে হয় বলে।

এই বাঁচাতেই সুমনার ভয়। এই নিয়মের ভেতর থাকতে থাকতে এক-এক সময় হাঁফিয়ে ওঠে সুমনা। অনাবশ্যক মা'র বন্ধু হয়তো এ-ঘরে তখন ঢুকে পড়েন। লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে অধীর আগ্রহে সুমনার ভালমন্দ জিজ্ঞাসা করেন। কুশল নেন। মা'র বেনামিতে অকাতরে অর্থব্যয় করেন। এ-সবের অর্থ বোঝে সুমনা। অন্তত বেশি করে বুঝিয়ে দিয়েছে লোকটা। লোকটা একদিন বলেছিল,—জানো সুমনা—

কী ?

তোমার বাবা ওর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেননি।

জানি।

জানো না।

কী?

লোকটা বলেছিল,—কিছু জানো না, আমি জানি।

সুমনা অন্তত কিছুক্ষণ কথা বলেনি। লোকটা বলেছে,—এই সুখ, এই শান্তি তোমাদের চিরকালের হোক। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

সুমনা ফুলে-ফুলে কাঁদছিল। কাঁধের ওপর হাত রেখে লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল—পৃথিবীকে সুন্দর করার স্পর্ধা আমার নেই, কিন্তু, তোমাদের এই স্বাচ্ছন্দ্যকে ভেঙে দিতে পারি, সে সাহস আমার আছে।

তবু কথা বলেনি সুমনা। সন্ধ্যার করুণ ছায়া নেমে আসছিল আস্তে আস্তে। লোকটা বলেছিল,—জানি, তোমার বাবা আর কোনদিন ফিরে আসবেন না। কিন্তু আমি আসব। তোমাদের দেখেও সুখ।

সুমনা চোখ তুলেছিল। লোকটা বলেছিল,—জানো, এ মুহূর্তে তোমাকে আমি গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি। কারণ, এই ক্লেদ তোমাকেও স্পর্শ করবে। অথচ তোমাকে আমি ভালবাসি।

তুমি চলে যাও।

কেন?

যেন ভয় পেয়ে গেছিল সুমনা।—আমি চিৎকার করব। তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি আমি।

অপরাধ? লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। তোমাদের সবকিছু জানি বলে? কিন্তু—

কী? সুমনাও কঠোর হয়েছিল।

লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল—তুমি ছলনা করেছ এতদিন। এই নরকের ভেতর ডেকে এনে তুমি আমাকে ঠকাতে চেয়েছ। লোকটা আরো যেন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চোখের ওপর প্রতিহিংসা সাজিয়ে রাখল। মুখাবয়বে একটা নিষ্ঠুর হিংস্রতা ঝুলিয়ে রেখে বলল

—এই নরকের জলহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে বাধ্য করেছ আমাকে। এই নোংরামির পচা পুকুরের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছ। লোকটা যেন ক্রোধে ফুলছিল। তুমি মনে রেখো সুমনা, যতদিন বাঁচব, তোমার সুখের ঘরের চৌকাঠে আমি চণ্ডাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।—লোকটা চলে গিয়েছিল।

আস্তে আস্তে মা এসে পাশে দাঁড়ালেন। ঘরভর্তি অন্ধকার। এই অন্ধকার, নির্জনতা, এই একাকিত্ব মা'র বড় ভয়। গা-টা কেমন শির-শির করে। ভয় যেন জড়িয়ে ধরে। মা ডাকতে গিয়েও থেমে গিয়েছিলেন। নিজের ঘরে বড় চুপি চুপি ফিরে এসেছিলেন।

এখন আকাশে তাকাল সুমনা একটু আগের সচ্ছল আকাশ এখন মেঘের আড়ালে। রাশি নক্ষত্র আগের মতো এখন আকাশ ভর্তি ছড়িয়ে নেই। লোকটাকে ভাবলে সুমনার মনে হয় সে যেন বড় নির্জন প্রান্তরে একক দাঁড়িয়ে আছে। এই জীবন, এমনিভাবে বাঁচার অর্থ অনেকদিন খুঁজেছে সুমনা। খুঁজতে খুঁজতে কতদিন ঢুকেছে বাবার ঘরে। যে ঘর এখন বন্ধ, কেউ খোলে না। মাঝে মাঝে খুলে মা-এর দৃষ্টি এড়িয়ে চুপিচুপি ঢুকে পড়ে সুমনা। ঘরে ঢুকে নিজের হাতে জানালাগুলো খুলে দেয়। বাবার বহু জ্বলন্ত স্মৃতি এ ঘরে তখন চোখের ওপর জ্বলে। বাবার শিকারের শখ ছিল। তার জ্বলন্ত উদাহরণ এ ঘরে থরে থরে সাজানো। সব নিজে হাতে সাজিয়ে চলে গেছেন বাবা।

বাবা আর ফিরে এলেন না। এ ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ বসে থেকেছে সুমনা। ঘরের ভেতর অসমাপ্ত জীবনকাহিনীর একটা পাণ্ডুলিপি আছে। কতদিন পড়বার চেষ্টা করেছে সুমনা। ঠিক বাবার ছবির নিচে। এই দম্ভপূর্ণ, কৃতিত্বপূর্ণ লোকটার জীবনের অসহায় বিবর্ণ পাতাগুলো এখন আরো মলিন, জীর্ণ হয়ে এসেছে। বহুকালের পুরনো কাগজের গায়ে বড় বড় অক্ষরে নিজের কান্না যেন নিটোল মুক্তোর মতো এত দম্ভের ভেতর জড়িয়ে রেখে গেছেন বাবা।

এমনি একাত্ম হয়ে ভাবতে ভাবতে যেন একটা বোধহীন বেবাক পুতুল হয়ে গেছিল সুমনা সেদিন, আর ঠিক সে মুহূর্তেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছিল লোকটা। লোকটা ঘরে ঢুকে শ্লেষের সুরে লম্বা করে উচ্চারণ করেছিল,—কিছু মনে কোরো না, তোমার অনুমতি ছাড়াই ঢুকে পড়েছি।

সুমনা তাকালে লোকটা বলেছে,—জানি এ ঘরে কেউ ঢোকে না। একটু ইতস্তত করে লোকটা বলেছে,—আরো জানি—

কী?

ঘটনাটা এ ঘরেই ঘটেছিল।

সুমনা বলেছে,—ঠিক আছে, ও ঘরে বোসো, আমি আসছি।

না।

জোর তোমার?

না। আমি রাজপুত্র নই। পরের ঘরে জোর কিসের? ব্যঙ্গাত্মক গলায় লোকটা বলেছে,—অবিশ্যি জোর করার মতো সম্পর্ক ছিল আগে, কিন্তু এখন জানি আমি কেউ না। কিন্তু সর্বনাশ আমার হাতের মুঠোয়।

আমি লোক ডাকব।

কিন্তু আমি কোন আগন্তুক নয় যে হঠাৎ পথ ভুলে ঢুকে পড়েছি—

আমি চীৎকার করব।

করো। খুব উদাস গলায় লোকটা বলল, তারপর হেসে বলল, তোমার গলায় অনেক জোর, পরখ করে দেখতে পার। লোকটা যেন একটু দম নিল, নিয়ে বেশ আরাম করে বসে পড়ল চেয়ারে। কিন্তু তাতে কি তোমার মৃত বাবার আত্মা শান্তি পাবেন? আরাম করে বসে পা নাচাল কিছুক্ষণ, তারপর ভৎ সনার সুর এনে বলল, যারা তোমার চীৎকারে এ ঘরে ঢুকে পড়বে, তারা বরং কৌতূহলী হবে, অন্ধকারে তুমি আমি মুখোমুখি বসে আছি বলে। লোকটা এবার অদ্ভুত একটা নাটুকে হাসিতে ফেটে পড়ে বলল,—তার চেয়ে তোমার

বাবার গল্প বলি শোনো। তারপর হাসি থামিয়ে বাঁকা করে বলল, সে বড় অদ্ভুত গল্প। আচ্ছা, তোমার মা নেই ঘরে?

জানি না।

—আহা, রাগছো কেন? ক্রোধ অনল, স্পর্শ করলে অপরকেই শুধু পোড়ায় না, নিজেকেও দাহ করে। আমি যেমন জ্বলছি।

লোকটা থামল না। যেন কিছু ভ্রূক্ষেপ করল না। বলল,—তোমার বাবা শিকারে গিয়ে একটা লেপার্ডের বাচ্চা এনেছিলেন। বাবা ফিরে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বাচ্চাটা ঘরের ভেতর ছেড়ে দিলেন। সেই তোমার মা-এর বন্ধু অসহায়। তোমার বাবা নিশ্চল মূর্তির মতো, তবু দম্ভভরে দাঁড়িয়ে। তোমার মা চীৎকার করে উঠেছিল। বন্ধুটি অসহায়। তোমার মা হাত জোড় করে বাবার কাছে মিনতি ভিক্ষা করছিল। মিনতিভরা গলায় কী যেন বোঝাচ্ছিল বন্ধুটি। বাবা পাষাণ। আর তুমি? তুমি তখন আয়ার হাত ধরে পার্কে বেড়াতে গিয়ে দোলনা চড়ছ।

আর ভাবল না সুমনা। আঁচলটা সংযত করে কাঁধে তুলল। বেরিয়ে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। রাস্তাটা দেখল ভাল করে। না—গলির মোড়ে, কি কৃষ্ণচূড়ার ছায়ার ওপরে কেউ দাঁড়িয়ে নেই।

এই পুরনো ঘর, এই পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে আজ চলে যাবে সুমনা। যেন পালিয়ে যেতে পাববে বলেই সুমনার সুখ। বিনয়ের চাকরি বাইরে, সুমনা জানে, যেখানে মা'র বন্ধুর নিঃশ্বাস নেই, মা-এর অক্ষম সোহাগ নেই। তবু কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করল সকাল থেকে। বিনয়ের কাছে সবকিছু গোপন করেছে সুমনা। সব দিয়েও যেন কিছু সরিয়ে রেখেছে।

সকালের আলো ফোটার আগেই সুমনার ঘুম ভেঙেছিল। তবু কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করল সুমনা। বিনয়েয় সঙ্গে রেজেস্ট্রী

করার মুহূর্ত থেকে ভেবেছে সবকিছু বলে ফেলে, স্বীকার করে, কিন্তু যতবার বলবার চেষ্টা করেছে, ততবার যেন কে তার গলা টিপে ধরেছে। সবকিছু তেমনি গোপন রয়ে গেছে।

ঘুম ভেঙে বাইরে তাকাল সুমনা। গলির মোড়ের কৃষ্ণচূড়া গাছটার অস্তিত্ব এই খোলা জানালার ভেতর থেকে অনুভব করা যায়।

দেখতে দেখতে চোখের ওপর সব কেমন উজ্জ্বল হল। কৃষ্ণচূড়া গাছের পাতার ওপর সূর্যের রং ছড়িয়ে পড়লে সুমনা উঠে বসল বিছানার ওপর। তারপর বাইরে এসে দাঁড়াতেই লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি। চমকে উঠল সুমনা।—তুমি?

আসতে নেই? খুব স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিল লোকটা।

বেশ কিছুক্ষণ বারান্দার ওপর নিথর দাঁড়িয়ে থেকে সুমনা বলল,—তোমাকে বোঝাই দায়। এতদিন পরে এমনি করে আসার কী যে অর্থ, তা আমি ধরতেই পারি না।

লোকটা হাসল,—শুনেছি পালিয়ে যাচ্ছ? তারপর সেই নাটুকে হাসিতে ফেটে পড়ে তেমনি সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটা।—আমার গতিবিধি খুব জটিল, না? ধরতে পার না?

সুমনা কঠোর হয়ে বলল,—তোমাকে কবেই ভুলে গেছি।

তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোমার সর্বনাশ আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছ, মাঝে মাঝে তাই তোমাকে আমার মনে পড়ে। লোকটা এবার চিবিয়ে চিবিয়ে বলল,—আমি ঠকেছি, ঠকানো তোমাদের ব্যবসা, তাই জানতে এলাম। এবার আর হাসল না লোকটা। বলল,—কেমন আছ? বিয়ের পর কেমন দেখতে হয়েছ তাই দেখতে এলাম। লোকটা এবার গলার স্বর পাল্টে বলল,—রোজ ভাবি বিনয়ের সঙ্গে দেখা হবে, বিনয়ের দোষ নেই, আমি ঠিক সময়মত মোড়ের মাথায় আসতে পারি না।

সুমনা যেন আঁতকে উঠল। তারপর ভয়ে, বিষাদে সুমনা কেঁদে ফেলল,—আমি তোমাকে চিনি না।

লোকটা যেতে গিয়েও থমকালো। ঘুরে দাঁড়িয়ে শ্লেষের গলায় বলল,—নতুন জীবনের পথে পা দিচ্ছ, চোখের জল দিয়ে নতুনকে অভ্যর্থনা করতে নেই। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা তোমাদের ওপর। আমাকে যখন চেনো না, আমার কাছেই বা কাঁদবে কেন?

কিছু যেন বলতে গেল সুমনা। কিন্তু পারল না, কথা খুঁজে পেল না। হাওয়ায় সুমনার আঁচল উড়ছিল। লোকটা সেদিকে তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় বলল,—আজ যেন নতুন করে দেখছি তোমাকে, নতুন চোখে। কেন বলো তো?

সুমনা চোখ তুলল এবার। নিচু গলায় বলল,—জানি না।

লোকটা এই প্রথম তাকাতে গিয়েও চোখ নামাল। বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে বলল,—ভয় নেই, কথা দিচ্ছি। তারপর হাঁটতে হাঁটতে বলল,—বিনয় এলে হেসো। যাচ্ছি।

পোশাক

টালিগঞ্জের ট্রাম গড়ের মাঠের গন্ধে যেন সাঁতার কাটছে আরো জোরে। পশ্চিম থেকে নিরালা প্রান্তর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে গঙ্গার শীতার্ত বাতাস আসছে ঝলকে ঝলকে। পাশে সারি শিরীষগুলোয় উড়ো-পাখির ঝাঁক। চুপ। নিথর কালো আকাশের চোখে দু' একটা অনুজ্জ্বল নক্ষত্রের দৃষ্টি। ট্রামের জানালা দিয়ে গড়ের মাঠের জটিল অন্ধকারে তাকাল ছায়া মিত্র।

দূরে আলিপুরের ট্রাম। রেড রোডের সারি আলোর বিন্দুগুলো স্পষ্ট হতে আরো অস্পষ্টতর হয়ে গেছে। থোকা থোকা গুচ্ছ অন্ধকার তাদের সামনে।

'ছায়া', গৌরাঙ্গ ডাকল।

'বলো।' একটু ইতস্তত করে জবাব দিলে ছায়া।

ওই গৌরাঙ্গ বোস ডাকলে এমনি উত্তর দিতে একটু দেরিই হয়ে যায় ছায়া মিত্তিরের। গৌরাঙ্গের কণ্ঠ যখন ছায়ার সঙ্গে কথা বলে, লক্ষ্য করেছে ছায়া, গলাটা তখন গৌরাঙ্গর কেমন চিড় খেয়ে যায়। কেমন কাঁপা আর অস্পষ্ট শোনায় কথাগুলো। বোকা বোকা দৃষ্টিতে ছায়ার চোখে তাকিয়ে থাকে পুতুলের মত। 'বলো', গড়ের মাঠের জটিল অন্ধকারে চোখ রেখে ছায়া আবার ছোট্ট জবাব দিল।

ট্রামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটা ফিটন যেন খড়ম পায়ে ছুটে চলেছে খট খট করে চৌরঙ্গির শড়ক ধরে। ব্যস্ততা, অন্ধকার, ট্যাক্সী একে একে সব—সব একে একে পার হয়ে এসে এসপ্লানেডে দাঁড়াল ট্রামটা।

'নামবে না?' আলতো ধাক্কা দিলে গৌরাঙ্গ।

ছায়া নামলো। ব্যস্ত-ভিড়ের আঁকি-বুকি ঠেলে ঠেলে ওরা এসে

হঠাৎ যেন বাড়িটা আবিষ্কার করে ফেলল গৌরাঙ্গ। এদিক ওদিক একবার ইতস্তত তাকিয়ে নিয়ে কাঁপা গলায় বলল, 'এস—'

ভয়ে ভয়ে গৌরাঙ্গর পিছু পিছু ঢুকলো ছায়া। সোজা তিনতলায় একটা ঘরে ঢুকে গৌরাঙ্গ হাসল, বোকার মত হি হি করে অনেকক্ষণ ধরে হাসল। বলল, 'এঁর কথাই বলেছিলাম হিরণ্যদা। আপনার হাতেই এ লাইনে এর প্রথম হাতে-খড়ি। একেবারে নতুন মুখ। তাতে কি? আপনার হাতেই অ, আ, ক, খ শুরু হোক হিরণ্যদা। ক্ষতি কি?

'নমস্কার।' একরাশ কাজের ভিড় থেকে মুখ তুললেন হিরণ্য সেন। 'অ, আ শেখার কী আছে? অভিনয় সম্বন্ধে সাধারণ একটু জ্ঞান থাকলেই যথেষ্ট। তাছাড়া, পেশাদারা মুখ আর ভাল লাগে না মিস মিত্র, অরুচি ধরে গেছে। বসুন আপনি।'

হিরণ্য সেন দেশের জন্যে কাজ করেন। ইউনিক ক্লাবকে গড়ে তুলেছেন এই হিরণ্য সেন। হিরণ্য সেনের পয়সা ক্লাবের বদনামকে পাচার করে দিয়ে অনেক গৌরব লুটে এনেছে। ইউনিক ক্লাব সত্যিই ইউনিক।

ফলে, ক্লাবে সাহিত্যবাসর বসান। শহরের তরুণ কবিদের ডেকে কবিসভা করেন। আর বছরে অন্তত বার দুই স্বরচিত পাণ্ডুলিপিকে রূপদানের চেষ্টা করেন এই হিরণ্য সেন এইসব নিশীথ নন্দিনীদের ডেকে এনে।

এই দু' দুবারের সম্পূর্ণ অর্থটাই চোখ বুজিয়ে ছুঁড়ে দেন দুঃস্থের সেবাকার্যে। শখকে শখও বজায় থাকে, দানকে দানও হয়ে যায়। হিরণ্য সেন বললেন, 'এবারের সমস্ত টাকাটাই রাজ্যপালের টি বি ফাণ্ডে দিয়ে দিচ্ছি গৌরাঙ্গ।'

'ভালো করছেন। খুব ভালো করছেন হিরণ্যদা। দেশের জন্যে তবু কিছু করছেন আপনি। চোদ্দ লক্ষ লোক যে দেশে টি বি-তে ভুগছে সে দেশের দিকে নিশ্চয়ই নজর দেবেন। আপনি বরেণ্য।'

'আচ্ছা, এটা একটু পড়ুন তো?' হিরণ্য সেন নিজের পাণ্ডুলিপি

টান দিয়ে বের করলেন। 'অ্যাকশন দেবেন কিন্তু।' চা'য়ের পেয়ালায় আঙুল ছোঁয়াল হিরণ্য সেন। 'আচ্ছা, আপনি কাল একবার দেখা করবেন।'

সেই প্রথম দিনের সব স্মৃতিটুকু কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে ছায়া। কত টাকা পেয়েছিল আজ তাও ঠিক মনে নেই। কেমন অভিনয় করেছিল তাও আজ ভুলে গেছে। সব, সব ভুলে গেছে ছায়া। সব। গৌরাঙ্গর পেছন পেছন প্রথম যেদিন টালিগঞ্জের ট্রামে উঠেছিল, গড়ের মাঠের মুখোমুখি আলিপুরের সে আলোর বিন্দুগুলোকে আজও কি মনে পড়ে ছায়ার? ট্রামের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ফিটনের খটাখট, বেবী ট্যাক্সী? সময়ের বিস্তৃত মাঠ পার হয়ে আজ বহু দূরে চলে এসেছে ছায়া। বহু ঘাটেই ঘুরেছে। অতএব—

অতএব খোলস পাল্টানোর মত অ্যামেচার থেকে পেশাদারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে বৃত্তিটা।

আর ক্লাবগুলো আছে তাই রক্ষে। দশটা-পাঁচটা অফিসবাবুদের সাতটা-দশটার শখটুকু বেঁচে আছে তাই রক্ষে। আর রক্ষে, এই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দল তাদের প্রতি সমানে করুণা বর্ষণ করে যাচ্ছে বলে। কোন ক্লাবে আজ কি অভিনয় ঠিক খবর এনেছে ওমনি। কার প্রগতিধর্মী নাটকে চাঁচাছোলা নায়িকা চাই, কার গলা চাই, কার নাচের পা, শুধু একবার কানে এদের উঠলেই হল। ছবিতেও কার পার্টনার চাই, কার বিয়ের সীনে চাই একগাদা আঁটোসাটো আইবুড়ো একস্ট্রা—মুখ একবার খুললেই হল। অমনি সেই তালতলার রমা চ্যাটার্জি, উমাপতি লেনের উমা হাজরা আর ওদিকে সেই ল্যান্স-ডাউনের নীলচোখ নীলা ভৌমিক, কি নিউ কলোনীর অনুভা সান্ন্যাল।

তাই, অমনি, পাঁচটা পেশাদার মেয়ের মতই 'পিণ্টু সামন্তর' অর্ধেক লোম উঠে যাওয়া আধটেকো তুলির সামনে ভুরু আঁকতে বসতে হয় ছায়াকে। মন না চাইলেও মন যোগাতে মন খুলে রসিকতা করতে হয়।

আর আশ্চর্য, এই মেকআপম্যান পিণ্টু সামন্ত। যেন মানুষের বিস্ময়। প্রায় ছ' ফুট লম্বা একটা লিকলিকে চেহারা। অথচ চোখ দুটো কী সতেজ। ঠোঁটে কোন রা নেই অথচ হাজারো কথার জটলা ঐ সজাগ সপ্রতিভ চোখ দুটোয়। ব্যাঙাচি যেমন ল্যাজ খসিয়ে ব্যাঙের গৌরব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তেমনি ওই পেণ্টার সামন্তর কিছুটা খসিয়ে খসিয়ে ঐ ছোট্ট পিণ্টু সামন্ততে আত্মপ্রসিদ্ধি লাভ করেছে লোকটা।

পিণ্টু যা জানে তা মন দিয়ে করে। শৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ের ছোকরা হীরোর দল পিণ্টুর হাতে ভুরু আঁকিয়ে গৌরব অনুভব করে। কাজে কিন্তু ফাঁকিটি নেই একটুও। অথচ—

অথচ ওই পিণ্টু সামান্ত। শুধু ওই ব্যাঙাচির মত আদিনাম হারিয়ে ফেলা পিণ্টু সামন্তকে সেই প্রথম থেকে এতদিনের পেশাদারী জীবনে আজো সমান ভয় করে আসছে ছায়া।

কিন্তু গৌরাঙ্গটা? ওকে কিন্তু ভয় করে না আর এখন। ভয় করে পিণ্টুকে। গৌরাঙ্গ ঘুরে ঘুরে কাজ আনে, কমিশন পায়। তাই একটু ফাউ আবদার নিয়ে একটু বেশী ন্যাওটা হতে চায়। একটু বেশী আঁচলের কাছাকাছি ঘুর ঘুর করে। কিন্তু পিণ্টু? জোঁকের মত তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিঁধিয়ে দিয়ে দেহের সমস্ত রক্তটুকুও যেন শুষে নিতে চায়। একটা সজাগ, শত সতর্ক দৃষ্টি সব সময় যেন পাহারা দিচ্ছে মেয়েদের শরীর।

ভুরু আঁকতে বসলে যদি পিণ্টুর চোখে চোখে পড়ে যায় তবে পিণ্টুর তুলি অনড় হয়ে যায় কিছুকালের জন্য। শরীরটা কেমন কুঁকড়ে আসে মেয়েদের। গায়ে একটা শির শির রোমাঞ্চ খেলে যায়। যেন কোন শিকারী পশুর হিংস্র দুটো থাবার সামনে ভক্ষ হিসেবে পড়ে আছে সে।

অথচ লোকটা সৎ। কিন্তু গৌরাঙ্গ? গৌরাঙ্গ অসৎ। মেয়েরা অপমান করে গৌরাঙ্গকে। মুখরা শিউলি থেকে মুখচোরা মায়া পর্যন্ত।—তার চেয়ে একটা কুত্তা পোষো সোনার গৌরাঙ্গ।

আর পিণ্টু? ইজ্জতে আঘাত লাগিয়ে কোন মেয়েই রেহাই পায়নি আজ পর্যন্ত। সেবার ফ্রেণ্ডস ক্লাবের 'মিশরকুমারী'তে নাহরিন-এর ভূমিকায় শিউলি একটা নতুন পেশোয়ারী ঘাঘরা পরেছিল। নোংরা গ্রীনরুমে অহেতুক লুটোচ্ছে দেখে পিণ্টু বলেছিল, অ্যাই, অ্যাই শিউলি, একটু গুটিয়ে নিতে পার না?

বিরক্ত হয়েছিল মুখরা শিউলি। 'স্থাখো, এতটা?'

'কী?' ইজ্জতে আঘাত লেগেছিল পেণ্টার সামন্তর। 'দূর, অতটা কেন? এই, এই, এইটুকু রে?' মুখরা শিউলি মূক হয়ে গেছিল লজ্জায়। সে পাশবিক দৃশ্যটা ফ্রেণ্ডস ক্লাবের আজো অনেকের চোখ বুজোলেই চোখে পড়ে।

গৌরাঙ্গ কাছে আসে, আসতে চায়। পিণ্টু থাকে দূরে। কাছে থেকে গৌরাঙ্গ যেন মেয়েগুলোকে চাটতে চায় লক লক করে। কিন্তু পিণ্টু? দূর থেকে দৃষ্টির বর্ষা ছুঁড়ে মারে। মেকআপ নেওয়া মেয়েদের কাছে দাঁড়িয়ে গৌরাঙ্গ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে হাঁ করে। দেখে রূপ, মেয়েদের যৌবন। পিণ্টুও তাকায় স্থির চোখে। দেখে তার পাকা হাত ঠিকমত রূপ দিতে পেরেছে কিনা। গৌরাঙ্গ তাকালে তার ঠোঁটদুটো নড়ে। একটা লোভী রোদ্দুর যেন তার ঠোঁটের ওপর চক চক করে। অথচ স্থির-চোখে দাঁড়িয়ে সে রূপে নিজের যোগ্যতা কতটুকু তা পরীক্ষা করে পিণ্টু। গৌরাঙ্গ সাধারণ। অত্যন্ত সাধারণ। পিণ্টু অসাধারণ। অনন্য, অসাধারণ।

তাই গৌরাঙ্গকে করুণা করে কিন্তু পিণ্টুকে ভয় করে মেয়েরা। যেন সত্যিই অসহ্য লাগে এই জীবনটা ছায়ার। অথচ এই আঁকাভুরু তুলে এই অভিনয় ভুললেও নিষ্কৃতি নেই।

হেনার সামনে বসে পিণ্টু সামন্ত তুলি থামিয়ে ফেলেছিল আরেকদিন। 'তোর গলার নীচে ওটা শ্বেতীর দাগ না হেনা?'

ভুরু আঁকা বেঁকে গেল, জগমণির মত লোক হাসানো চরিত্রে নিজেই কেঁদে ফেলেছিল স্টেজে এসে। ফলে জনসেবা সঙ্ঘ পয়সার জন্য আরো তিনদিন কাঁদিয়েছিল হেনাকে।

অভিনয় শেষে ছায়া বলেছিল, 'এ লাইনে কেন এলে হেনাদি ?'

চোখের জল মুছেছিল হেনা। 'উপায় কি বল্ ? তিরিশটা বছর যখন পার হয়ে গেল, অপারগ বাবা, নিজেই চোখের জল মুছিয়ে দিতে দিতে তুলে দিলে এক তৃতীয় পক্ষের হাতে। কুষ্ঠরোগী। পরের বছর মারা গেল। কি করি বল্ ? বাবাকে আর বাচ্চাটাকে এখন আমাকেই যে দেখতে হয় ?'

এমনি প্রশ্ন আরো দু' একজনকে করেছে ছায়া। সেবার "পথের শেষে"—রমেশের ভূমিকায় রিহার্সাল দিচ্ছিলেন 'নবরঙ্গমের' এক লাজুক ভদ্রলোক। এই শিউলি বিনা দ্বিধায় বলেছিল, 'দূর আপনি কি ? একটা মেয়েকে নিজের করে একটু জড়িয়েও ধরতে শেখেননি এখনো' ? 'সুন্দর' সুপুরুষ চেহারার ভদ্রলোক কেমন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল লজ্জায়। বিনা দ্বিধায় এই শিউলি ভদ্রলোকের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলেছিল, 'ধরুন, এমনি করে ধরুন।'

বাসে উঠতে গিয়ে ছায়া জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা, তোমার একটু বাঁধলো না শিউলি ?'

'কিসে ?'

চারিদিকটা ভাল করে জরিপ করে চুপি চুপি বলেছিল, 'ভদ্রলোককে ওমনি করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিতে ?'

যেন একটা অত্যন্ত অর্থহীন কথা শুনতে হচ্ছে শিউলিকে। 'দূর, বাঁধবে কেন ? আর বাধলে চলবে কেন বল ? প্রথম যখন এ রোলটা করি, সত্যিই তখন বেঁধেছিল। পরিচালক মশাই বলেছিলেন, এসব সতীপনা নিয়ে বালীতে থিয়েটার করতে আর এস না মা।'

কোন ফাঁকি নেই, কোন নিষ্কৃতি নেই এই পেণ্টার সামন্তর চোখের সাঁড়াশি থেকে। চোখ বুজিয়ে শুয়ে শুয়ে কত কথাই যেন ভাবছিল ছায়া।

জানালার সামনা-সামনি পত্ররুক্ষ একটা তেঁতুলগাছ। সামনে খোলা "কালিন্দী"টা বন্ধ করল ছায়া। অন্যমনস্কভাবে তাকাল বাইরেটায়। বিকেল হলেই শীত শীত করে। জ্বর জ্বর ভাব। ঘুম

নেই রাত্তিরে। চোখের কোলে কালিটা যেন বড্ড বেশী গাঢ় হচ্ছে দিন দিন। স্টেজের আলোয় চোখ দুটো বড় জ্বালা করে আজকাল।

'ষোড়শী'টা দু'আঙুলে টেনে নিয়ে দু'একটা পাতা ওল্টাল অন্যমনস্কভাবে। মাস দুই আগে প্রথম যখন রক্ত উঠেছিল, সেই নিয়েই "কালিঘাট রিক্রিয়েশন ক্লাব" এনাসিনার ভূমিকায় অভিনয় করেছে ছায়া। এই অসুস্থ শরীরে প্রচুর হাততালি কুড়িয়েছিল সেই দৃশ্যটায়।

পত্ররুক্ষ তেঁতুলের ডালে তাকাল ছায়া। কী একটা মিঠে জড়তা সে দৃশ্যটায় নবারের চোখ দুটোয় জড়িয়ে ধরেছে। সে মদিরতায় জড়িয়ে জড়িয়ে আশ্চর্য অভিনয় করেছিলেন ভদ্রলোক। "তোমার দুঃখ কিসের বেগম? তুমি নিশাতবাগের গুলাব, হারেমের আলো করা মণিবেগম। এই ধন, এই ঐশ্বর্য, এই জহরত পান্না, এই মসনদের গৌরব, এ সবি তো তোমার।"

ক্লাবের সেক্রেটারী ভদ্রলোক পার্টটি করেছিলেন। অত্যন্ত শৌখিন ভদ্রলোক। সত্যি-সত্যিই আতর-ছিটিয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণের জন্যে মনটা কেমন যেন মাতাল হয়ে গেছিল ছায়ার। দৃশ্যের শেষে কী একটা আবেশে এমনি একটা মদির-রাত আশা করেছিল ক্ষণিকের জন্যে। অমনি একটু সুখ, একটু সোহাগ, একটু স্পর্শ।

অথচ তৃতীয় দৃশ্যের হারেমের আলো করা মণিবেগম, অভিনয় শেষে সেই সেক্রেটারী ভদ্রলোকের কাছেই হাত পেতে দাঁড়িয়েছিল। পারিশ্রমিকের টাকাটা হাতে নিয়ে পিঁপড়ে পায়ে বেরিয়ে এসে আকাশে তাকিয়েছিল ছায়া। সীনের বাইরে সত্যিই একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে। সত্যিকারের চাঁদ। আকাশটা আলোয় ভরে গেছে। সামনের সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা আশ্চর্য সার্থকরূপে সেজে উঠেছে হঠাৎ।

হলটার পাশে চুপি চুপি দাঁড়িয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকক্ষণ দেখেছিল ছায়া। অন্যমনস্কভাবে একটা দোপাটি ছিঁড়ে খোঁপায় গুঁজেছে। পিণ্টু সামন্ত হনহনিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়ে থমকে

দাঁড়িয়েছে। শিকারী বেড়ালের মত তীক্ষ্ণ চোখে শুধু লক্ষ্য করে গেছে সবটুকু।

শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সোনার গৌরাঙ্গ। 'পৌঁছে দেব?'

'না।'

'কেন?'

আরো কঠোর হয়েছে ছায়া। 'না। এই নাও তোমার কমিশন।'

আর সঙ্গ দিতে চায়নি গৌরাঙ্গ।

সেই থেকে এক মাস পরে এসেছিল গৌরাঙ্গ। একটু যেন সেজে এসেছিল গৌরাঙ্গ সেদিন। 'যাবে?'

'কোথায়?'

তেমনি লোভী চোখ দুটোয় তাকিয়েছিল গৌরাঙ্গ। 'রঘুনাথ আঢ্যির পলাশী। যাবে? আলেয়া, পঁচিশ।'

'যাবো।'

'যাবে?' আরেকটু কাছে সরে এসেছিল গৌরাঙ্গ। 'আলেয়ার পার্টটা মনে আছে তো?'

'আছে।'

'ভোলোনি?'

ভুলিনি।

'দেখাওনা এট্টু।' প্রায় ছুটে এসে হাতখানা জড়িয়ে ধরলো গৌরাঙ্গ।—'সেই, সেই, সেই জায়গাটা।'

তবু কঠোর হতে পারেনি ছায়া। আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছে, 'ভুলিনি।'

সেই উত্তর-কলকাতার "সান্ধ্যবাসর", গিলেকরা শৌখিন রঘুনাথ আঢ্যির পলাশী আর পঁচিশ টাকা। আর তাতেই এই প্রথম প্লেটখানা তুলিয়েছিল ছায়া মিত্তির। ধর্মতলা স্ট্রীটের এক্সরে হলের রেডিওলজিস্ট এক্সরে প্লেটের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে আশ্বাস

দিয়েছেন এ পৃথিবীতে তার প্রয়োজনের। বলেছেন, কিস্সুটি ভাববেন না মিস মিত্র, বিট এ্যাফেক্টেড ; সেরে উঠবেন আপনি।'

ছায়া সত্যিই কিছু ভাবেনি তখনকার জন্যে। ছ'নম্বর প্লেটটা দু'আঙুলে ছুঁয়েছিলেন তারপর। অবস্থাকে লঘু করবার জন্য রসিকতা করবার চেষ্টা করেছেন, 'জানেন মিস মিত্র, এঁদের এক আশ্চর্য খেয়াল। প্রত্যেক মাসেই প্লেট তুলিয়ে পেটের বেবীকে এঁদের দেখা চাই। ইটস এ গেম, না? একরকম খেলা, কি বলুন?'

আস্তে আস্তে পা দুটোকে টেনে টেনে হাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল ছায়া। সোজা হেঁটে গড়ের মাঠে আলোর একটু আড়ালে অনেকক্ষণ বসেছিল সেদিন। হাত দুটো যেন কাঁপছিল থরথর করে। কপালটাকে কে যেন শক্ত দুটো হাতে চেপে ধরেছিল। অন্ধকার থেকে আলোয় তাকিয়েছিল হকচকিয়ে। লোক আর লোক। ওদিকের চৌরঙ্গীতে কী আশ্চর্য ব্যস্ততা। আর ওপারে, গাঢ় অন্ধকারে একটা মাতাল ট্যাক্সীতে যেন দুটো মত্ত জানোয়ার। এক এক করে সব লোকগুলোকে সেদিন পরীক্ষা করেছে ছায়া। আর ওমনি মনে পড়ে গেছে শত সতর্ক সদাজাগ্রত দুটো শিকারী চোখ পিণ্টু সামন্তর। আরো অন্ধকারে ডুবে গিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসেছে ছায়া। এত লুকিয়ে, এত অন্ধকারের রাজ্যে ডুবে গিয়েও তবুও নিষ্কৃতি কই? অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে খেতে এত অন্ধকারেও চোখের সামনে ভিড় করেছে নবীন সঙ্ঘের "চন্দ্রগুপ্ত"। পেছন থেকে একটা শিকারী থাবা আঁচল ধরে টান দিয়েছে। সেই কুৎসিত রোগটায় তুই না এখনো ভুগছিস কাজল।

ওদিকে সংকেত দিয়েছে পরিচালক। সীন উঠেছে। শিকারী থাবা আঁচল ছাড়েনি তবু। সত্যি সত্যিই সাজপোশাকের দাম আদায় করে ছেড়েছিল। "চলোর্মির" "চিরকুমার সভায়" ভুরু আঁকতে আঁকতে বলেছিল, 'আচ্ছা, বালীগঞ্জের সেই কাজলা ব্যানার্জির কথা মনে পড়ে ছায়া?'

'পড়ে।'

'তার কান খসে গেছে। নাক বসে গেছে?'

চোখ বুজোলেও এত অন্ধকারে তবু চোখে পড়ে "রূপালী সজ্ঞের" "সাহাজান"। বন্দী সাজাহানের তৃষিত কণ্ঠে কাঁদছে। কাঁদছে। সব কাঁদছে। কাঁদছে সাজাহান, কাঁদছে বেহালা। বৃদ্ধ সাজাহানের বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস আছড়ে পড়ছে কারাগারের পাষাণ হৃদয়ে। রুদ্ধ দরজায় মাথা কুটছে সাজাহান—জাহানারা, জাহানারা—

বৃদ্ধ পিতার সে শোকার্ত চীৎকার—তবু কাছে আসতে দেয়নি শোকাতুরা অনুভাকে। সেক্রেটারীব সামনে খানিকটা গ্লিসারিন হাতে ঢেলে দিয়ে অনুভার বুকে একটা সজোরে চাপড় মেরে বলেছিল, 'এই খাঁচাই, যদি খচরামি করে তো খাবি খাবে স্টেজে উঠে ?'

কাঁদছে সাহাজান, কাঁদছে দর্শক, কাঁদছে বেহালা। সেই সঙ্গে জাহানারাও কাঁদছে গ্রীন রুমে। কবে নাকি তার একটু অ্যাজমার ভাব ছিল বলে।

হঠাৎ সেই মাতাল ট্যাক্সিটার হর্নে চমকে উঠেছিল ছায়া। এতক্ষণ পরে মত্ত যুবক যুবতী দুটো খানিকটা যেন প্রকৃতিস্থ হয়ে আলোর রাজ্যে ফিরে যাচ্ছে। প্রায় সমস্ত পথটাই কাঁপতে কাঁপতে বাড়িতে ফিরে এসেছিল সেদিন ছায়া।

ইস্! চমকালো ছায়া। ভাবতে ভাবতে সময়টা যেন কখন বুড়ো হয়ে গেছে। বিকেলের শেষ রোদ আর নেই। তেঁতুল গাছটাকে আর ঝাপসাও দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দে উঠে বসলো ছায়া। "কালিন্দী" আর "ষোড়শী" পাশে ঠেলে রেখে দিল। কান খাড়া করে আরো কিছুক্ষণ শুনলো শব্দটা। 'কে ?' আঁচলটা বুকে তুলল ছায়া।

'আমি ?'

'আমি কে ?' আপন মনে উচ্চারণ করল ছায়া। বিছানার চাদরটা ঝেড়ে-ঝুড়ে একটু গোছাল করে বাইরে এসে দরজাটা খুলে দিল ছায়া।

আর দরজা খুলতেই চোখোচোখি। 'আরে তুমি ?'

হাসি হাসি ঠোঁটে গৌরাঙ্গ ভেতরে ঢুকলো। যাবে ?,

'ভেতরে এস।' ছায়া প্রায় যেন হাত ধরে টান দিয়ে বসালো বিছানায়। 'বলো।'

'যাবে?'

ছায়া এদিকওদিক তাকাল। না, ঘরে কেউ নেই। 'কোথায়?'

'এই তো সামনে। চন্দনপুর। হিরণ্যদার দেশ গো। শ্রীরামপুর? পরেই সব যাচ্ছে, স্টেজ, ড্রেস, অর্কেস্ট্রা, সব। লাইব্রেরী না কি যেন প্রতিষ্ঠা দিবস। 'নীলদর্পণ।' প্রায় উর্ধ্বশ্বাসে, একনিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে ফেলল এক সঙ্গে গৌরাঙ্গ।

'কবে?'

'কাল।'

'কাল?' এক ঝলক বিস্ময় যেন উপছে উঠলো ছায়ার কালো চোখ দুটোয়। 'কাল?'

সিগারেট জ্বালাল গৌরাঙ্গ। 'আবার পরের দিন ফিরেই হিরণ্যদার টি বি ফাণ্ডের চারিটি শো। আচ্ছা, কেমন কাজ আনি বলত?' ধোঁয়া ছাড়ল গৌরাঙ্গ। 'পরপর দুটো। পঁচিশ, পঁচিশ, পঞ্চাশ। যাবে না?'

'যাবো।'

'যাবে?'

আরো একটু কাছে সরে এল গৌরাঙ্গ। হামাগুড়ি দিয়ে ওদিকের জানালাটা আধভেজা করে দিলে। খপ করে একটা হাত ধরে ফেলল গৌরাঙ্গ। ডাকলে, 'ছায়া'। গলাটা কেমন গাঢ় শোনাল গৌরাঙ্গর।

'বল,' ছায়া বলল।

এদিকওদিক তাকাল গৌরাঙ্গ। বেশ অন্ধকার ঘরখানায়। হাতটায় চাপ দিলে গৌরাঙ্গ।

'বল না'—ছায়া প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলল।

গৌরাঙ্গও যেন কাঁপল। বেশ খানিকটা কাঁপল অন্ধকারে। 'তোমাকে আমি ভালবাসি ছায়া।'

বুকটা যেন বড্ড বেশী ওঠানামা করছে ছায়ার। ঘরখানাও গাঢ়

অন্ধকারে ভরে গেছে। আরো একটু কাছে সরে এল গৌরাঙ্গ। হাতটায় আরো একটু চাপ দিলে। 'এ লাইন ছেড়ে সরে দাঁড়াই চল।'

তেঁতুল গাছের মাথা ডিঙিয়ে শীত ছুঁই ছুঁই হাওয়া আধভেজা জানালার ঈষৎ ফাঁক দিয়ে এই অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে চুপি চুপি। গাঢ় গলায় বলল গৌরাঙ্গ, 'চল না, কী লাভ এমনি করে বেঁচে থেকে।' অন্ধকারে যেন মিশে গেছে দুজনে। যেন বুকের ওপর প্রায় তুলে নিয়েছে গৌরাঙ্গ ছায়াকে

ভূত দেখার মত আঁতকে ওঠে ছায়া। অন্ধকারে হাঁফাতে হাঁফাতে ওঘরে ছুটে পালায় ছায়া। না শোনেনি কেউ। ঘুমোচ্ছে। সকলে ঘুমোচ্ছে। প্রেতিনী মা'টাও ঘুমোচ্ছে। ঘুম থেকে মাঝ রাত্তিরে কি যেন দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে। প্রেতিনী মাটা জিজ্ঞাসা করে কপালে হাত বুলোতে বুলোতে 'হাঁ মা, ঘুমোসনি যে?' ফিরতে দেরি হলে অন্ধকারে পথ চেয়ে বসে থাকে চুপি চুপি। নিঃসাড়ে শুয়ে শুয়ে কতদিন দেখেছে ছায়া, অন্ধকারে ভূতের মত এ-ঘরে উঠে আসে। অন্ধকারে চুপি চুপি পেটের ওপর হাত বুলোয়। টপ টপ করে তপ্ত অশ্রু ঝরে পড়ে ছায়ার নাভিকুণ্ডলীতে। পেটের ওপর কান পেতে কী যেন শোনে প্রেতিনী মা'টা।

কাঁপতে কাঁপতে ছায়া আবাব ফিরে এল এ ঘরে। মা ঘুমোচ্ছে। অন্ধকারে বিছানা হাতড়ালো ছায়া, না, গৌরাঙ্গ নেই। পোড়া সিগারেটটা নিবু নিবু হয়েও জ্বলছে কোণের অন্ধকারে। যেন গৌরাঙ্গর ঐ ইচ্ছেটার মত। পা দিয়ে গৌরাঙ্গর ইচ্ছেটাকে থেঁতলে দিলে ছায়া। নিভে গেল সিগারেটটা।

পরের দিন সিগারেট জ্বালিয়ে গৌরাঙ্গ ঠিক তেমনি ঘুর ঘুর করছে গ্রীনরুমের কাছাকাছি। চন্দনপুরের এই গ্রীনরুমটাও যেন ঠিক সেই কলকাতার মত।

পিণ্টু সামন্তর আধটেকো তুলির তলায় বসে চোখ খোলবার সাহস হয়নি ছায়ার। এত সতর্কতা সত্ত্বেও তবু পিণ্টুর চোখে চোখ পড়ে গেছে বার কয়েক। যেন তাচ্ছিল্যের খানিকটা কালো রং

তুলির মাথায় মাখিয়ে নিয়ে একটানে কোন উপায়ে চোখ দুটো এঁকে দিয়েছে ছায়ার। কেঁপেছে ছায়া। কলকাতা হলে হয়ত ডুপ্লিকেট জোগাড় করে দিত। গা-টা কেমন শির-শির করেছে। একের পর এক সিগারেট জ্বালিয়ে পাশে বসে তা সবটুকু লক্ষ্য করেছে গৌরাঙ্গ।

রাত তিনটের কাছাকাছি অভিনয় শেষ হয়ে গেল। স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলল ছায়া। দ্বিতীয় অঙ্কে কাশির ঝোঁক এসে পড়েছিল। রক্ত উঠেছিল কাশিতে। ছোট্ট রুমালটা মুখে বুলিয়ে নিয়ে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে জানালার বাইরে দোপাটি আর গাঁদার জঙ্গলের ভেতর। বেড়ালের মত চোখে শুধু লক্ষ্য করেছে দৃশ্যটা। কিচ্ছুটি বলেনি পিণ্টু সামন্ত।

আস্তে আস্তে বাইরে এসে দাঁড়াল ছায়া। আকাশে তাকালো। আহা, ঠিক সেই "কালীঘাট রিক্রিয়েশন ক্লাব"-এর সেই সীনটার মত একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে। সত্যিকারের চাঁদ।—অপলক তাকাল ছায়া। আহা, ভদ্রলোক সত্যিই ভালো অভিনয় করেছিলেন সেদিন—"তুমি নিশাতবাগের গুলাব, হারেমের আলোকরা মণিবেগম। এই ধন, এই ঐশ্চর্য, এই জহরত, পান্না, এই মসনদের গৌরব, এ সবি তো তোমার।" চমকালো ছায়া। 'আরে আপনি?'

'হ্যাঁ। কী দেখছিলে?'

ইতস্তত একটু হাসলো ছায়া। 'কই, কিছু নয়।'

'ছায়া', কাঁপা গলায় ডাকলো হিরণ্য সেন।

'বলুন।' ছায়া কাঁপলো।

রাস্তার পাশে বনশিউলি ফুটেছে কত। একটা ছিঁড়ল হিরণ্য। বলল, 'আচ্ছা, এ জীবন তোমার ভাল লাগে ছায়া?'

ছায়া তেমনি নির্বাক আকাশে তাকালো। নির্বাক জ্যোৎস্নায় কী স্তব্ধ আকাশটা।

কাছে সরে এল হিরণ্য সেন। 'বলো, লাগে, ভাল লাগে এই অভিনয়, এই ভুরু আঁকা, ওমনি করে রং কালি মাখা? বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর তুমি।'

কী সুন্দর পৃথিবীটা। হকচকিয়ে চারিদিকে তাকাল ছায়া। যেন সেই "কালীঘাট রিক্রিয়েশন ক্লাব"-এর অভিনয়ে এমনি একটা সুন্দর রাত ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে যেন অনেকখানি মরুভূমি পার হয়ে ওপাশের সবুজ ঘাসের দ্বীপের ওপর দাঁড়াল দুজনে। 'তুমি বিশ্বাস কর ছায়া, আমার সব আছে। অভাব শুধু যা বলব বলে আজ এসেছি এখানে, অভাব শুধু তুমি। তুমি বিশ্বাস কর।' চুপ করল হিরণ্য সেন।

কী সুন্দর এই রাতটা! নির্বাক, নিশ্চুপ পৃথিবী। বনশিউলির পাতায় পাতায় শিশিরের শব্দ। হাতখানা মুঠোয় ভরে নিল হিরণ্য সেন। প্রায় মুখের কাছে মুখ এনে বলে, 'এই রাত না তুমি, কে বেশী সুন্দর বলত? হাজারো মেয়ের ভিড়ে তোমাকে লুকিয়ে রেখে খেলা করছি মনে মনে। সেই ভিড় থেকে তুমিই আমার মনের বুড়ী ছুঁয়ে দিয়েছ যে আগে। আসছি দাঁড়াও।'

গ্রীনরুমটায় তাকাল ছায়া। অস্পষ্ট আলোটা আর চোখে পড়ছে না। হয়ত নিবিয়ে দিয়েছে শিউলি নিজেই। একটু আগে ওরা মদ খাচ্ছিল। শিউলি, রেবা, শিখা। পা টিপে টিপে যখন বেরিয়ে আসছিল ছায়া, শিউলি ডেকেছিল, আয়না ছায়া। বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে ছায়া। তবুও শিউলির শাণিত বিদ্রূপটা এখনো কানের পর্দায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ছায়ার। একটু খা না, ছায়া. জাত যাবে না। হি হি হি. শিউলি উন্মত্ত হেসেছে।

গ্রীনরুমের পাশ দিয়ে ভূতুড়ে কঙ্কালের মত সভাপতির লুকানো মালাটা নিয়ে আসতে গিয়ে যেন জোরেই একটা হোঁচট খেল হিরণ্য সেন। ইস্! এত বিশ্রী মেয়েগুলো। কী জঘন্য দৃশ্যটা। 'সুরশ্রী' অর্কেস্ট্রার পেটমোটা ক্লারিওনেটবাবু গাড়লের মত গলায় একটু কাশলো। কুকুরে যেমন ঘা চাটে, সোনার গৌরাঙ্গ ওমনি যেন কি চাটছে লক লক করে। পেটমোটা ঐ ক্ল্যারিওনেটবাবু যেন একটা বিরাট অজগর সাপ। আর শিউলি যেন তার চোখের সামনে একটা সোনা-ব্যাং।

অথচ, একটু আগেই না ক্ষেত্রমণির ভূমিকায় অভিনয় করেছে এই মেয়েটা? পদিময়রানীর চক্রান্তে নীলকর সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে সমস্ত দর্শককে কী আশ্চর্য না চমকে দিয়েছে একটু আগে? "ময়রাপিসি মোরে এমন কথা বলো না। মুই পরাণ দিতি পারব, ধম্ম দিতি পারব না, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারব না,—ভাতারই যেন জানতি পারবে না, ওপরের দেবতা তো জানতি পারবে।" এই ক্ষেত্রমণি না এই সোনা-ব্যাং শিউলি মুখার্জি?

বাইরে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো হিরণ্য সেন। অথচ কি সুন্দর এই বাইরের পৃথিবীটা।

ওপরে তাকিয়ে তাকিয়ে ছায়াও দেখছিল আকাশটাকে। সমস্ত নক্ষত্রগুলো হঠাৎ যেন খসে পড়ছে তার চোখের ওপর। আগুনের এক-একটা জ্বলন্ত পিণ্ড যেন এক-একটা নক্ষত্র। চোখে হাত চাপা দিয়ে বনশিউলির ঝোপের দিকে ছুটে গেল ছায়া। 'পিণ্টুদা', জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল ছায়া।

'কাঁদিস না চুপ কর।' হাউ হাউ করে ঠিক শিশুর মত কাঁদছে শিউলি পিণ্টুর নীরেট বুকটার ওপর মুখ ঘষে ঘষে। থর থর করে বড্ড বেশী কাঁপছে দেহটা ছায়ার। 'কাঁদিস নে,' ছায়ার আঁচলটা দিয়ে চোখটা মুছিয়ে দিল পিণ্টু। 'চুপ কর।'

পা কয়েক আরো এগিয়ে এসে থমকে গেল হিরণ্য সেন। ইস্!

আকাশটা যেন অনেক দূর, অনেক ওপরে উঠে গেছে হঠাৎ। পা দুটো যেন কাঁপছে হিরণ্যর, এখনি যেন পড়ে যাবে সে। খপ্ করে কামিনী গাছের ডালটা ধরে ফেলল হিরণ্য সেন।

দু' একটা ফুল, দু' ফোঁটা শিশির ঝরে পড়লো কাঁধে। মালাটা গাছের একটা ডালে গলিয়ে দিল হিরণ্য সেন। কাঁধের ওপর ঝরে-পড়া ফুলটাকে দু' আঙুলের নির্মম ধাক্কায় ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে বলল—"বেশ্যা, সব বেশ্যা।"

কালের পদাবলী

কখনো কয়লা দিয়ে, কখনো বা খড়িমাটি ঘষে ঘষে দেবদেবীর মূর্তি আঁকত লখনা। শিবের পাশে দুর্গা আর শিবের গলায় সাপ ঝুলিয়ে দিত আগে, ইদানীং আর শিবলিঙ্গ কিম্বা কালী মূর্তি নয়, একেবারে সাদা-কালোয় মানুষের মূর্তি গড়ে ফুটপাতের ওপর। আঁকে আর আঁকে, গম্ভীর আর তন্ময় হয়ে এঁকে এঁকে একসময় যখন চোখ তুলে তাকায় লখনা, চোখে পড়ে পথচারী থমকে আছে। ফুটপাথের ওপর তার আঁকা মূর্তির চারপাশে কিছু সরল মুখের ভীড়। মূর্তি দেখছে, তাকে দেখছে। ভীড়ের ভেতর, মানুষের ভেতর তখন মা-এর মুখ খোঁজে লখনা। মা-এর মুখ মনে পড়ে।

মনে পড়লেই এই ভিড় পেছনে রেখে ভোরের ট্রেনে চেপে সে কোথাও চলে যাচ্ছে বলে মনে হয়। গাড়িতে সবজির গন্ধ, মাছের বাসি আঁশ ছড়িয়ে আছে অভ্রের মত। পাশে মা। সবকিছু পেছনে সরে যাচ্ছে, বড় দ্রুত সব পেছনে ফেলে রেখে মা-এর হাত ধরে সে এসে নামল একটা ইস্টিশানে। ভোরের গাড়ি তাদের ইস্টিশানে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। গাড়ির শেষ বিন্দু তার চোখের ওপর থেকে মুছে গেলে সে তাকাল। সেই মা আজ নেই।

লখনা চোখ বুজে একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে ছড়িয়ে দিল। দিয়ে চোখ খুলল। তার মূর্তির চারপাশে এখন কিছু সরল মুখের চিহ্ন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মূর্তি দেখছে। দু' একজন করুণা করে মূর্তির ওপর দু' একটা পয়সা ছিটিয়ে দিচ্ছে।

মা এই ইস্টিশানে নেমে প্রথমে চিনেছিল একজন পড়শীকে। ওভার-ব্রিজের ওপর মাকে টেনে এনে বলেছিল, অচেনা ঠাঁই কোথায় যাবি ছেলের হাত ধরে। দুশমন আছে, কুলিশ্চে আছে, তার চেয়ে পুব কোণে অই আমার আস্তানা। চল। মাঝে মাঝে এল পুলিস এসে

নামিয়ে দিয়ে যায়, এই যা। থাক। আমার পাশে থাক। সূয্যি-ঠাকুর কারুর কেনা নয়, ঘুষ খায় না। ওদ্দুর ওখানটাতেও আসেরে লখিন্দরের মা।

সেই থেকেই তাকে নিয়ে মা-এর ঘরকন্না এই ইস্টিশানের ওভার ব্রিজের ওপর। সংসার বলতে কুড়িয়ে আনা গোটা দুই টিনের মগ। একটা সানকি। ভুসোপড়া চার টুকরো আধলা ইট। মা এই ইটের ওপর হাঁড়ি চড়াত। ভিক্ষের চাল ফোটাত। পড়শীর কথায় পুঁটলি থেকে তেলচিটে পিঁজে যাওয়া ময়লা গামছাখানা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর লখনাকে বসিয়ে মা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। মা যেন অনেকখানি সম্পত্তি কিনে ফেলেছে, মুখের ওপর, চোখের পাতায় এমন একটা ভাব এনে বলেছিল, লখিন্দর তুই শুয়ে শুয়ে টেন দেখ, নোকনস্করের হাঁটা-চলা দেখ, আমি ঘুরতি গালাম, কস ঠানদিকে।

পড়শীকে একদিন লখিন্দরের মা প্রশ্ন করেছিল, ঠানদি, কে কে আর আছে গো এখানে?

পড়শী বলেছিল, কে নেই? তারপর ঠোঁটের ভেতর এবং দাঁতময় নেশা ঘষে বলেছিল, কে নেই? কোন গাঁয়ের নোক নেই, শুধু কি আমাদের দক্ষিণদিকির?

সব দিকির?

একে একে সব ঘুইরে দেখাব তোকে। ঠানদি বলেছিল, মৌলালি যাবি, শ্যামবাজার। কালীঘাটির মন্দির পানে তাকালি পরানে ভিরমি লাগবে তোর। ঠানদি নেশার কৌটো বন্ধ করে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বলেছিল, সব চিনবি একে একে। কত কি দেখবি। থাক না। কলকেতায় আমাদের মত সব জাতির নোক আছে। এককুড়ি বাঁশের সমান পেল্লায় মনুমিন্টির দিকি তাকালি দিষ্টি তোর সূয্যির চরণে গিয়ে ঠেকবে। সায়েবরা বাইনেচে বটে। হেম্মত আছে।

কিন্তু এ সব দেখার মা সময় পেল না। মা থাকল না। তখন আর বয়েস কত লখনার?

কিন্তু গোঁফের রেখা সবে যখন উঠি উঠি, খুঁটে খেতে শিখে গেছে

লখনা, তখনই এই বুড়োটা তার সঙ্গী হয়ে এল একদিন। একদিন সঙ্গে এসে আস্তানা চিনে গেল আর তার দিন চারেক পরেই লেক-বাজারের সামনে থেকে উঠে এল লোকটা, সঙ্গে একটা কুকুরছানা। কুকুরটাকে বুকের ওপর তুলে চিত হয়ে ঘুমোত বুড়ো। আর গালি-গালাজ করত লখনাকে। তোর শরীলে আমার অক্তনি, আমার দুঃখু বুঝবি কি তুই। বুড়ো এবার একনাগাড়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বেশ কিছুক্ষণ কাশত। কাশির ঝোঁক কমে এলে বলত, পেলাটফরমির ওদিকি কি রাজশয্যে তোর, আমি কুকুরছানা বুকে করি শুই?

বুড়োটা কিন্তু দিনান্তে মা-এর পাতা ঘরে কিছু ফুটিয়ে দিত লখনাকে। মেঙে আনা বাসি রুটি রোদ্দুরে সেঁকে সেঁকে গুছিয়ে রাখত। আর রুটি খেতে দিয়ে বলত, শালা খাবি-দাবি, নায়েক হলি মাগি ধরবি। তারপর কুকুরটাকে লক্ষ্য করে বলত, বয়েস আমারও ছিল রে কুত্তা, মেয়েনোকের গন্ধ পেলি ভাদ্দুর মাস শরীলকে জাপ্টে ধরত।

লোকটা মাঝরাতে কোন কোনদিন উঠে বসে থাকত। এই ওভারব্রিজের ওপর থেকে ডিস্ট্যাণ্ট সিগন্যালের সীমানা ছাড়িয়ে আরও দূরে ওভারহেড ওয়ারের হিজিবিজির ভেতর তাকাত। কোন কোনদিন ছানাটার ওপর ঘোড়া চড়ার মত করে দুদিকে পা দিয়ে বসে কোমর-দোলাত। লখনা শুনত, কুকুরছানা কুঁই কুঁই করছে। ছড়া কাটছে বুড়ো, 'দোলায় আছে ছ'পন কড়ি গুনতি গুনতি যাই।'

মাঝরাতে যখন সব নিঝুম, শুধু আলোগুলো নিয়মরক্ষা করত, কিন্তু এক মাঝরাতে তাও আর জ্বলল না লোড শেডিং-এ। তখন এই ওভারব্রিজ একটি মাত্র ঘন রেখায় রূপান্তরিত হয়ে লাইনের আরো কাছে যেন নেমে এল, লখনাকে তখন জাগিয়ে নিজের গল্প বলেছিল বুড়ো। বুঝলি লখনা আমার বিবি মরেনি রে। চিলি যেমন মাছ নেয় হাতে ঝাপটা মেরে, এমনি বুঝলি শালা নিয়ে গেল। এখন বুড়ো হয়েছি, বড় মনে পড়ে রে লখনা! লখনা পাশ ফিরে শুলে ওকে বুড়ো গা ছুঁয়ে ডেকেছিল, এই লখনা, বুড়ি মৌলালিতে, জিন্দা রে।

ময়লা জঞ্জাল খাবার জন্যি হাতির পেটের মত যে নল আছে না মৌলালিতে তার ভেতর থাকে। বৈঠকখানার বাজারে একদিন কপির পাতা কুড়োচ্ছিল, আমি নুইকে নুইকে দেখে এয়েছি। কাঁকে একটা বাচ্চা রে লখনা। ফর্সা। মোটা-গোটা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়ে বলেছিল, সেই থেকি কত ঘুরি, চোখে পড়ে না।

বুড়োর রুক্ষ চুল ইদানীং পাটের মত। দাড়ি গোঁফ ততোধিক সাদা। বাঁকা ধনুকের মত দেহটায় আরো নুয়ে পড়ে হাঁটে আজকাল। কানের পাশ থেকে নিয়ে পোড়া বিড়ি টানতে টানতে বলে, ভোলার পিসি অনেক আগে আজাদ কলিজির সামনে একদিন দেখে এয়েছে। নোহানক্কর, ভাঙা টিন, পেরেক বল্টু, অবারের বল বিক্কিরি করছে একটা নোক, সে পাশে বসে আছে। চিইবে চিইবে ভুট্টা খাচ্ছে।

লখনার মা লখনাকে ছেড়ে চলে গেলে লখনা গড়িয়াহাট বাজারের কাছে ঘুরছিল। পয়সা চাইছিল। বুড়ো মাথা বাঁকানো লোহার একটা লম্বা কাঠি দিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে ময়লা সরাচ্ছিল। কাগজ তুলছিল পিঠের ওপর ঝোলান চটের থলিটাতে। ভাঙা কাচ, ফুটো কৌটো, টুকিটাকি। ক্লান্ত শরীরে বাজারের গেটে বসে পড়ে বিড়িতে টান দিয়েই লক্ষ পড়েছিল লখনার দিকে। আর্ট কলেজের একজোড়া ছেলেমেয়ে কাঁধের ওপর চটের শৌখিন ব্যাগ ঝুলিয়ে মানুষের চলাফেরা লক্ষ করছিল। ড্রইং করছিল। লখনা হাঁ করে তাকিয়ে থাকলে বুড়ো কাছে গিয়ে বলেছিল, এই—

কি? লখনা তাকিয়েছিল।

থাকিস কোথায়?

চোখ তুলে তাকিয়েছিল লখনা। ইস্টিশানে।

যেন, কত কালের চেনা এমন গলায় বুড়ো বিকৃত উচ্চারণ করে বলেছিল, বাবুদের মোচ্ছব দেখলি পেট ভরবি তোর? মাকে বলে দেব তোর।

সম্পূর্ণ এই অপরিচিত লোকটার কথায় লখনা প্রথমে কোন কান

দেয়নি। বুড়ো বলেছিল, ই, নবাব ঘরির আজপুত্তুর। কথা কানে করে না।

মা নি। লখনা নিস্পৃহ তাকিয়েছিল এবার। কাটা পড়েছে।

কিসি? বুড়ো একটু ধাতস্থ হয়ে বলেছিল।

ভোরের মালগাড়িতে। মালটানা টেনে গো।

ইহি। বুড়ো গলায় অদ্ভুত শব্দ তুলে বলেছিল, থালি কে আছে তোর?

লখনা আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে পা বাড়ালে বুড়ো বিড়িটা নিবিয়ে আবার কানের পাশে যথারীতি গুঁজে রেখে বলেছিল, শোন—

কি? ঘুরে দাঁড়িয়েছিল লখনা।

শোন না। কাছে আয় না। আসতে নি?

লখনা কাছে আসেনি। হাঁটছিল। বুড়োও পিছু পিছু হাঁটছিল। রেল ব্রিজের ওপরে সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে বলেছিল, কেউ তোর নি, তবে তোর সঙ্গে থাকি। দুজনে কাজ করব, খাব, আমারও কেউ নি রে লখনা।

লখনা দ্বিমত করেনি। বলেছিল, দাঁইড়ে কেন, বস না। এলিং-এর পূব দিকটা আমার। থাক। অই ফুলিরা থাকে বাঁ-দিকি।

বুড়ো গোল গোল চোখ দুটোয় লক্ষ করছিল ফুলিদের। লখনা বলল, এল গেলি ভয় পেয়ে পড়ে যেউনি যেন।

বুড়ো কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে হকচকিয়ে লাইন দেখেছিল। উত্তর দিকের দৃষ্টি শেষের অংশটা কত হিজিবিজি। গোলকধাঁধার মত। কাকের জটলা তারের ওপর। ডাইনে একটা ইঞ্জিন কল। কয়লা কুড়োচ্ছে দুটো ছেলে। ইঞ্জিন থেকে গড়িয়ে আসা জলে বার-বার হাত ভেজাচ্ছে বছর বারো বয়েসের একটা মেয়ে।

এই পুলের ওপর দাঁড়িয়ে বুড়ো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। লখনার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, এই পোলির ওপর দাঁইড়ে মালগাড়ি গেলি ভিংচি কাটবি কসে। শালা কেটেছে তোর মাকে।

ফুলির মা এতক্ষণ এ-সব লক্ষ করছিল। কোলের বাচ্চাটা চেল্লাচ্ছিল। ধমকাচ্ছিল ফুলির মা, বকছিল, আবার আদর করছিল। কিন্তু তবুও থামছিল না। ফুলি ইঞ্জিনের জল ঘেঁটে এসে মার মাথায় হাত ছুঁইয়ে বুড়োকে লক্ষ করলে মা গর্জাল—আবাগির ঝি, দেকিস কি, ভাইটাকে এট্টু ধর না। কাপড়ের ভেতর থেকে থলথলে একটা মাই বার করে বাচ্চাটার মুখের ওপর ঝুলিয়ে রেখে বলল, কোথায় একটু সামাল দিবি, তা না, ড্যাব ড্যাব করি ভাতার দেখছে। তারপর মুখের ভেতর দুধহীন বোঁটাটা পুরে দিয়ে গলার স্বর মোলায়েম করে বলল, বুড়োর তো ঐশয্যির সীমা নি। দেখবি ত?

বুড়ো আরো হকচকিয়ে তাকিয়ে থাকলে ফুলির মা চটে উঠল, ইস্,—শক কত, ড্যাবরা চোখি তাইকে আছে। তারপর হাতটা পেটের ওপর নিচে বুলিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গি করল। পেট কত্তি খুব সুখ লাগে, না?

সুখ যেন আমার কেনা গোলাম, আমার একার খালি। বুড়ো এবার বাতাসে কথা ভাসিয়ে চলে যাচ্ছিল। লখনাও সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল। ফুলির মা হেঁয়ালি করে বলেছিল, দেখ ফুলি দেখ, বাবুর আবার আগ হচ্ছে। নাড়ি ছেঁড়া নয়ত, যে দুঃখু আমার বুঝবে? এখন খেয়ে আঁচাতি, হেগে ছোঁচাতি শিইকিচি, আর কি!

লখনা তিন সিঁড়ি ভেঙে আবার যথাস্থানে উঠে এলে, হাত বাড়িয়ে একটা রুটি সামনে ধরে ফুলির মা বলেছিল, ই, কী গোঁয়ার গো, নামচে? কাছে সরে গিয়ে বলেছিল, নে খা। ছড়া কেটেছিল তারপর, "আপনি পাইনা খেতি, শংকরাকে ডাকে শুতি"। তারপর আক্ষেপের সুরে বলেছিল, বড় হলি ত মেয়েছেলের বগলদাবা খুঁজে বেড়াবি। গোঁ দেখলি মনে হয় বড় হলি ভাল জাতের কুত্তা হবি। এখন ত মালুম হয় কেন্নোর মত। গুইটে আছে।

লখনা ওভারব্রিজের সিঁড়ির ওপর খোলামকুচি দিয়ে হিজিবিজি আঁকত প্রথমে। কখনো পুতুল এঁকে দেখাত ফুলিকে। বুড়ো বকত, এশন দোকানির সামনি মাল ভর্তি নরি এয়েচে, যানা খুঁটগে না।

নোকে কত চাল কুড়োচ্ছে, গম কুড়োচ্ছে, কুইড়ে কুইড়ে কোঁচড় ভর্তি করছে, আর তুই কিনা মোচ্ছব করতি নেগেছিস সিঁড়ির ওপর। নিকচে? অত কি নিকিস?

শিব।

শিব? খেঁকিয়ে ওঠে বুড়ো। শিব না শিবের এ। খাইয়ে দাইয়ে মানুষ, করছি, ল্যাস্থাগিরি করবি নি? সাধে মা তোর কাটা পড়েছে?

হঠাৎ বৃষ্টি এল। বৃষ্টির ছাঁটে ব্রিজের অনেকখানি ভিজে যাচ্ছিল। শীত শীত হাওয়ায় ন্যাকড়া-কানি চাপা দিচ্ছিল ফুলির মা ছোট্ট ছেলেটাকে। আর ফুলি ঘুমোচ্ছিল। ফুলি আমি এট্টু ঘুইমে নি, ওঠ। রাত্তিরি ত জাগতি হবে। আবাগির বেটারা এদিকে এইগে এলি ডাকিস।

এমনি অবাগির বেটাদের জ্বালা সর্বত্র। হাতে চুড়ি দেখলেই মাঝরাত্তিরে টেনে তুলবে অমনি। বিচিত্র এই জগৎটার ভেতর দিনে দেখা নেই, কিন্তু সন্ধ্যার আলোয় আস্তানা পেলেই চেহারা একটু অন্যরকম। ফরিদপুরের করিম মিঞা, শ্যামসুন্দর ত্রিপুরার। গলিত কুষ্ঠে হাতের দুটো আঙুল রেখে আসা বাঁকুড়ার গগন বুড়ো। সিউ-প্রসাদ ছাপরার। দেশওয়ালী আর সম্পর্কের চেনামুখ ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। ফলে জ্বালা সর্বত্র। সব জাতের ভেতর। মৌলালির পাইপের ভেতর। চৌরঙ্গীর মনোহর দাস তড়াগের পাশে গুমটিটায়। ল্যান্সডাউনের গাড়ি বারান্দার নিচে। কালীঘাটে। ক্ষীরোদবাবুর বাজারের লবিতে। সর্বত্র। দিনের আলোয় অন্য চেহারা, অন্য মুখ। খোলা বাজিয়ে গান গায় কেউ। সুযোগ বুঝে কেউ গলার মাফলার সাফাই করে শীতে, হাতের ব্যাগ হাপিজ করে কেউ। বীরভূমের মংলু সর্দারের পুরো সংসার শ্যামবাজারে। লোকটা আফিং খায়। রাত্তিরে ঝিমোয় আর বউকে অন্য লোকের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে পাহারা দেয়। হারু ঘরামির আমেজ আসে রাত্তিরে পচাইতে। মেয়েছেলে

খোঁজে তখন। দিনে মংলু সর্দারের বউ সাপ নিয়ে পাড়ায় ঘোরে। খেলা দেখায়। কেষ্টনগরের বিধবা পুঁটির মা বেশীর ভাগ বেশ্যাপট্টিতে ঢোকে দাঁত আর ঘা-এর পোকা তুলতে। বয়েসকালে এ পাড়াতেই কদর ছিল, আজ আস্তানা শ্রীমানি বাজারের সামনে। মেদিনীপুরের কালুর মা এখন থাকে ডকের কাছে। জড়ি-বুটি আর তাবিজ-কবচের পুঁটলি নিয়ে মেটেবুরুজে ফেরি করে—"বাত ভাল, ব্যথা ভাল, মেয়েলি দোষের মাদুলী লেবে গো, জনম নিরুধির বড়ি নেবে গো।"

ফুলির মার চোখে ঘুম আসছিল। তবু বকে যাচ্ছিল, রোজ সকাল হলি দেখ, ভরে যাচ্ছে। কেন, গাঁ নি? শাক-পাতা নি গাঁয়ে, অস যত কলকেতায়। পাগলা দাশু গল্প করেছে, কি নোক আসছে গো ফুলির মা শ্যালদায়। গাঁয়ে আর গাছের পাতা নি। ফি রোজ নাশ পড়ে থাকচে শ্যালদার মুকি। রাতে কোন কোনদিন ডাল-রুটি দিতে আসে ভদ্দরনোকে। ফুলির মা গর্জায়, কেন, পুকুরি গেঁড়িগুগলি নি, ফুইটে ফুইটে খানা। সুখে খাতি কলকেতায়?

ফুলির মা তবু জাগবার চেষ্টা করে। ছেলেটাকে জোরে জোরে চাপড়ায়। কি একটা দুঃসহ জ্বালায় ফুলিকে লক্ষ করে বলে, ওলাউ-ঠোদের কামের অঙ্গ শুয়োরে ছোবলায় না? গো শুকনি খুবলে খুবলে খায় না কেন?

ফুলি চেঁচিয়েছে মাঝরাতে কতদিন। রুখে দাঁড়িয়েছে লখনা। শালা কথা কইনা, কইনা, কাল শালা তাড়াচ্ছি টিকিটবাবুকে বলে। নইলে এক বাপের জম্ম নয়। ফিরে গেছে গোষ্ট। দাঁত ভেঙচিয়েছে, শালা দোখনে ভূত, নাতি মারব মুকি।

ফুলি একদিন বলেছিল, এই লখনা তুই আমার কে রে?

কে আবার?

তবে এত করিস কেন?

লখনার জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

ফুলি রেলিং-এর ওপর একটা পা তুলে দিয়ে লখনাকে দেখছিল। লখনা লজ্জা পাচ্ছিল। ফুলিও কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায় এক-এক সময়।

বুকে কানি টেনে চাপা দেয়। আরো কাছের হয়ে ফুলি বলে, এই ইস্টিশান ভাল না। গাঁয়ে থাকলি গোষ্টর গা গতর থেঁতে দিত। সাহস হত এমনি আমার পেছনে নাগতি? বাবুনোকরা গাঁ থেকে তালাক দিত।

লখনা কোন উত্তর দিচ্ছিল না। ফুলি বলে, মা-বোন বলি জ্ঞান-গম্যি নি। ভগমান তোর ভাল করবে রে লখনা। সুয্যি ঠাকরুণ এখনো পশ্চিমদিকি ওটেন, পূবদিকি সন্ধে হলি খালপানিতে অস্তো যান।

তবু কথা বলেনি লখনা। ফুলি বলে, তোর ধম্মঠাকুর তোকে ছেড়ে সেই যে গেল গঙ্গাসাগরে, কই, ফিরলনি তো আর?

না। বুড়ো বোধহয় মরে গেছে। লখনা নিস্পৃহ গলায় উত্তর দেয়।

ফুলি ঘাড় নাড়িয়ে বলে, আচ্ছা, গঙ্গাসাগরি মরলি অনেক পুণ্যি হয়, না রে?

হ্যাঁ।

সগ্‌গি যায়?

যায়। লখনা দ্বিধাহীন উত্তর দেয়।

ফুলি এবার ভারিক্কি গলায় কথা কয়। সাস্তোরে বলে, "সব তিরথি বার বার, গঙ্গা সাগর একবার"। তারপর একটু থেমে কি যেন দেখে চারদিকে। বলে, আচ্ছা, সগ্‌গি অনেক সুখ আছে, না রে?

হুঁ।

আমার খুব ইচ্ছে হয় সগ্‌গি যাই। ওখানে মানুষ খুব খাতি পায়, না রে?

হুঁ। লখনা খুব ছোট করে জবাব দেয়।

ওখানি গেলে খুব শালা খাব, খাতি খাতি মরে যাব। গোষ্ট শালা ঘুর ঘুর করলি সগ্‌গের নোক শুলে দিত, না?

লখনা ও-সবের উত্তর না দিয়ে এই হাত পাঁচেক দূরে তার নিজের ঘরে শুয়ে সারারাত ভেবেছিল ফুলিকে। সকালে উঠে বলেছিল, গাঁয়ে তোরা ফিরবি নি আর?

ঘরি ? নড়েচড়ে হি-হি করে হাসতে গিয়ে থেমে গেল ফুলি। ঘর ত আর সগ্‌গো নয়, খাব কি ? ঘরদোর বিইকে গেছে দেনায়। ক্ষেতখামার নি, কিচ্ছু নি, কেউ নি আমাদের। তারপর লখনার দিকে চোখ তুলতে কেমন যেন লজ্জা করেছে ফুলির। ভাইকে কোলে তুলে বলেছে, শত্তুর বাড়াস কেন রে লখনা, আমি তোর কে ?

আমারও। লখনা ও কথার জবাব না দিয়ে নিস্পৃহ গলায় বলে, আমারও কেউ নি। কিচ্ছু নি।

ভাই-এর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে ফুলি। করে নিজের কথার রেশ টানল। গোষ্টরে রুকিস, শত্তুর বাড়াস, আমার জন্যি এত করিস কেন ?

এমনি। লখনা রুক্ষ চুল হাতের বুরুশে পেছন দিকে ঠেলে দিল। একটা ফুটো বেলুন কুড়িয়ে এনেছিল রাস্তা থেকে, সেটা ফুঁ দিয়ে ফোলাবার চেষ্টা করে ফুলির দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, নে ভাইকে দে।

এমনি ? মাথা নিচু করে ফুটো বেলুনটা হাত থেকে নিল ফুলি। তারপর মা-এর মত করে শাস্ত্রবাক্য আওড়াল, "হিংসে সব করতি পারে, শুধু পুত করতি নারে।" ফুলি এবার তাকাল লখনার চোখে। তোর মুকি নাতি মারব বলল যে ?

আগে।

আগ দত্তি। একবার ঘাড়ি চাপলি কুলকাণ্ড উইড়ে নিয়ে যায়। জ্ঞানগম্যি হাইরে ফেলে মানুষ। তারপর ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ফুলি বলে, তোর আপদ-বিপদ হলি আমি করব কি ? হেঁট হয়ে ভাইকে এবার শুইয়ে দেয় ফুলি। বুক থেকে আঁচলটা পড়ে গেলে লখনার মনে হল ফুলি কেমন বড় হচ্ছে। দেখতে কেমন ভাল লাগে বেশ। ফুলি লজ্জা পেলে লখনা বুঝতে পারে। লখনা তখন হাত দিয়ে চুল ঠিক করে, গায়ের ধুলো-ময়লা হাত দিয়ে চাপড় মেরে মেরে পরিষ্কার করে। মনে হয়, সেও যেন ফুলির মত বড় হচ্ছে। ফুলিকে লুকিয়ে গোঁফের রেখায় হাত তোলে তখন।

আচ্ছা, ফুলি বলে, তখন তোর কাছে গেলি তুই তাইড়ে দিবি না রে ?

লখনা হাসে। হ্যাঁ।

সকলে তাইড়ে দেয়। ফুলি লখনার রসিকতা বুঝতে পেরেও চুপ করে থাকে। তারপর বলে, শ্যালদায় ছিলুম, এল পুলিস। বড়বাজারের গুদোমঘরের সামনে থেকে চৌকিদার। শালার পেটের ভেতর খড়ের গাদা। শোভাবাজারি এক দালান বাড়ি ফুটো হয়ে জল পড়ত। একদিন গরম জল ঢেলে দিয়েছিল ভেড়ুয়া লোকটা। এই দেখ, বলে ফুলি হাঁটুর ওপর থেকে কানি গুটিয়ে উরু দেখাল। শালা বিইষে গিছিল ঘা-টা। পরানে মরতি মরতি বেঁচে গেছি। দেখ না। কাপড় এবার হাঁটুর নিচে নামিয়ে দিল ফুলি। মানষির চামড়া গায়ে নি, বড় নোক ত ? ফুলি এবার মুখটাকে সুচোলো করে ঘা-এর বর্ণনা দিল। উঃ সেকি যনতোন না। ভেতরি যেন সাপে সাপে শংক নেগেছে। গো সাপে কুইরে কুইরে খাচ্ছে। ফুলি এবার ভাই-এর মাথায় হাত বুলোয়। ভাগ্যিস, ননীর নাগেনি। লম্বা করে উচ্চারণ করে ফুলি, কোথায় যাই বলত আমরা। পরক্ষণেই আক্রোশে মাথা ঝাঁকায়, এশনের পচা চাল খেয়ি গতরে ভীম হচ্ছে, ধরাকে সরা জ্ঞান করে ঢ্যামনার বাচ্চারাও।

লখনা ঘা-এর দাগ দেখে চোখ বুজিয়ে ফেলেছিল, উরুর ওপর সাদা আর বাদামি রঙে মেশানো কোঁচকান চামড়া। দাগটা মাকড়সার জালের মত উরুর অনেকখানি জুড়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, একটা বড় গোছের বিষাক্ত মাকড়সা যেন মাংসটাকে সজোরে কামড়ে ধরে আছে।

সেদিন সারাদিন এদিক-ওদিক ঘুরল লখনা। ঠিক আঁকার মত ফুটপাত খুঁজে পেল না। মনে ধরল না। রাত্তিরে ফিরে এসে দেখল সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সারি-সারি গোটা বিশ সংসার শুয়ে আছে। ফুলির মা নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্চে।

লখনা একসময় ঘাড় তুলে দেখল, ফুলি আর জেগে নেই। প্রথমে

মুখ গুঁজে, তারপর পাশ ফিরল। পরে চিত হয়ে শুল লখনা। আকাশে তাকাল। একটু আগের মেঘ এখন বেশ পরিষ্কার। হাওয়া দিচ্ছিল। অবারিত আকাশ জুড়ে অজস্র তারা। জ্বলছে আর জ্বলছে। কুকুরগুলো ঝগড়া করছে মাঝে মাঝে। একটা পাগল গেটের মুখটায় দাঁড়িয়ে অনর্গল বকে যাচ্ছে। গালাগাল করছে। লখনার হঠাৎ চোখে পড়ল ফুলির মা এবার উঠে বসেছে। ঢুলছে।

হঠাৎ তার মনে হল তার গাঁয়ের তারাগুলো আরো বড়, আরো বেশী উজ্জ্বল ছিল। আরো অনেক আলো ছিল গাঁয়ের তারাগুলোয়। নইলে মাঠঘাট, নদীর জল অত সাদা হত কি করে? বাবলা গাছের কচিপাতা অত স্পষ্ট হয় কি করে? লখনার ইচ্ছে হল আগের মত সাদা আলোয় মাঠের ওপর ছুটোছুটি করতে। কপাটি আর বউবসানো খেলতে। কিম্বা এই চাঁদের আলোয় কাদাজল ঘেঁটে ঘেঁটে ধান খেতের ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা আলপথ ধরে হেঁটে যেতে। ধানের খেত পার হলে গাঁ। গাঁয়ের মুখে তেঁতুল গাছ। সজনে গাছে ডাঁটা ঝুলছে, কচুরিপানা ভর্তি পুকুরের পাড়ে। নরম, সবুজ ঘাস তার পায়ে এসে পড়ুক। ফড়িং উড়ে যাক। সাতরঙের প্রজাপতি ধরবার জন্যে মাছরাঙা আর সাদা বক উড়িয়ে দিয়ে বাবুই পাখির ঝুলন্ত বাসার নিচে দিয়ে ছুটবে সে। খুব জোরে ছুটবে।

হঠাৎ এমনি ভাবনার ভেতর কুঁচকে কুঁকড়ে দু' হাটু বুকের অনেক কাছে রেখে ধনুক হয়ে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল সে। এই ঘুমের ভেতর সত্যি-সত্যি যেন সে হাঁটল। মাছ ধরল। জলে নেমে হুড়ো-হুড়ি করল। চিত সাঁতার কাটল। মানুষ-জল পুকুর থেকে ডুব দিয়ে মাটি তুলল। জল ছিটিয়ে খেলা করল। দেখল, গাছে গাছে দোয়েল, শ্যামা। মাছরাঙা লম্বা ঠোঁটে জলের দিকে তাকিয়ে। বাবলার ছায়ায় বসে বাঁশী বাজাল। জোনাকি জ্বলতে দেখল দেবদারু পাতার ফাঁকে ফাঁকে। মিহি সুরে ঝিঁ-ঝিঁ পোকা গান ধরেছে।

ঘুমের ভেতর সে বৃষ্টিতে ভিজল। পেয়ারা গাছে উঠল। পেয়ারার ডাল ভাঙলো। সবুজ কচি একজোড়া পেয়ারাকে আদর করল।

ডাঁসা পেয়ারা কচকচ করে চিবিয়ে চিবিয়ে খেল গোটা দুই। খেঁজুর গাছে রস ভর্তি ভাঁড়। উপচে নিচে পড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ বৃষ্টি এল। পড়শীর ঘর থেকে টোকা চেয়ে মাথায় দিল। জেলেরা জাল নিয়ে হাঁটছে। কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঢেঁকিতে চাল কুটছে দুটো যুবতী গোছের মেয়ে। কাছে দাঁড়িয়ে পেয়ারা গাছের ডাল হাতে কিছুক্ষণ দেখল। তারপর বুড়ো শিবতলার পাশ দিয়ে চৌধুরীদের পদ্মদীঘি বাঁয়ে রেখে চলে গেল চড়কমেলায়। পাঁপরভাজা, বেলুনের দোকান। বাউলের একতারা বাজিয়ে গান শুনল। চিনাবাদাম ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খেল। তারপর বঁটি কাটারীর দোকান দেখতে দেখতে মনোহরী দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল। লখনা আবছা ঘুমের ভেতর দেখল, তারই বয়সী একটি মেয়ে চুড়ির দাম করছে। ডান হাতটায় একটা দগদগে ঘা। পুড়ে গেছে। ঘা-টা বীভৎস। বিষিয়ে উঠেছে। পোকা হয়েছে। ক্রিমিকীটের মত সাদা সূক্ষ্ম পোকায় সারা হাত ভরে আছে। কিলবিল করছে। মুখে একটা কাতর ছায়া। চোখ দুটো বড় নিস্তরঙ্গ। বিহ্বল।

লখনা বলল, তোমার হাতে ঘা?

হ্যাঁ।

পোকা গিজ গিজ করছে।

মেয়েটি কথা বলল না।

এক হাতে চুড়ি পরে না।

মেয়েটি সরে দাঁড়াল। কাপড়ের ভেতর হাত লুকিয়ে বলল, আচ্ছা, কেউ এমন আছে, এই ঘা সারিয়ে দিতে পারে?

এস।

মেয়েটি লখনার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটল। মেলার বাইরে এসে বলল, আমার সঙ্গে এস।

অপরাহ্ণ বেলায় হেঁটে হেঁটে একসময় সন্ধ্যার আলোয় ডুবে গেল ওরা। জ্যোৎস্না ফুটল আকাশে। জ্যোৎস্না মাড়িয়ে মাড়িয়ে বড় ঘনিষ্ঠ পাশাপাশি হাঁটল দুজনে। মেঠো পথ ভরে আছে মাটির গন্ধে।

কচি ফুলের রূপোলী পাপড়ি থেকে সৌরভ ঝরে পড়ছে। একসময় লখনা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও, তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে হাঁটতে।

তুমি ?

আমি বুড়ো বটের ওপাশে, কামিনী-গাছের পাশ দিয়ে চলে যাব। বনঝোপের ভেতরে একটা গাছে অদ্ভুত একটা সবুজ রঙের ফুল ফোটে। আমি তুলে আনব। কথাটা বলে খুব লজ্জা পেল নিজে।

আনলে ? মেয়েটি এবার লাজুক চোখে তাকাল।

সেই ফুলের পরাগ তোমার হাতে লাগিয়ে দিলে তুমি ভাল হয়ে যাবে।

মেয়েটি কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়ে বলল, আমার কিন্তু কিছু নেই, কি দেব তোমাকে ?

কিচ্ছু না। তুমি ভাল হয়ে যাবে এটাই আমার পাওনা। তুমি চুড়ি পরতে পারবে ওতেই আমার সুখ।

মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে লখনা ছুটল এবার। আলপথের ওপর দিয়ে চাঁদের আলো মাড়িয়ে, বিষধর সাপের খোলস ডিঙিয়ে, কিন্তু না, গাছের ফুলটা কে চুরি করে নিয়ে গেছে, গাছটাকে স্পর্শ করে লখনা বুঝল।

খুব ক্লান্ত পায়ে ফিরে এল লখনা। প্রচণ্ড যন্ত্রণা আর উৎকণ্ঠায় কাছে এসে বলল, নেই, কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে ফুলটা।

মেয়েটির চোখ দিয়ে জল-গড়িয়ে পড়লে লখনা আশ্বাসের সুরে বলল, আমাদের ভাল হওয়ার চাবিকাঠি, বেঁচে থাকার সোনার কাঠি কোথাও নেই বুঝলে ? ওই হাত থেকে সারা অঙ্গে বিদ্যুতের মত দ্রুত ছড়িয়ে যাবে ঘা। পোকায় ভরে যাবে। আমরা এই দুষ্টব্যাধির শীকার হয়েই থাকব চিরদিন। উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাব। বেঁচে থাকব। কেঁদ না।

হঠাৎ মালগাড়ীর শব্দে লখনার ঘুম ভেঙে গেল। পাশ ফিরে শুয়ে দেখল ফুলির মা বসে বসে ঢুলচে। ফুলি ঘুমোচ্ছে। বুকটা ওঠানামা

করছে। ফুলির উরুর দাগটা বেশ স্পষ্ট। লখনা এবার গাড়িটায় কতগুলি বগি আছে তা গুণতে থাকল!

গাড়ি চলে গেলে লখনা বুঝল, পূবদিকের চা-ঘরের দোকান থেকে ধোঁয়া উঠছে। চা-এর জল ফুটবে এক্ষুণি। রেলকুলি আর রিকশো স্ট্যাণ্ডের দু'চারজন চায়ে চুমুক দিলে তবে ভোর হবে। পূবদিকে আস্তে আস্তে আলো ফুটবে। এই ভোরের আলো দেখতে দেখতে কুঁড়ি থেকে ফুল হবে। চড়ারোদ স্টেশন চত্বরে ছড়িয়ে পড়বে। লখনা এখন এই সকালে পায়রার ঝাঁক উড়তে দেখল বাঁশের ওপর চৌকো মাচান-বাঁধা একটা দোতলা বাড়ির ছাদ থেকে। লাইনের ওপর চড়ুই কিচ-কিচ করছিল। রোদে ডানা ভেসে যাচ্ছে। তার মাথার অনেক কাছে, রেলিং-এর ওপর শালিখ পাখি ওড়বার আগে একটা শব্দ রেখে উড়ে গেল।

লখনা চোখ মুছে উঠে বসল। তারপর খড়িমাটি আর কাঠকয়লা হাতে নিয়ে হাঁটল। গা-টা কেমন ভার-ভার। কপালের বাঁ-দিকে রোদ্দুরের সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা ব্যথা বাড়ে আজকাল। ফুলি বলে আধ-কপালে ব্যথা। শনি-মঙ্গলে তিনটে ছারপোকা ধরে কলার ভেতরে খা, ব্যথা পড়ে যাবে।

লখনা আজ আর বিনাটিকিটে শ্যালদার দিকে গেল না। স্টেশন-মুখের রাজপথ ধরে সোজা হাঁটল এবং হাঁটতে হাঁটতে এল একটা পার্কের কাছে। পার্কের পাশেই একটা প্রেক্ষাগৃহ। টিকিটের লাইন পড়েছে। মুখোমুখি তিন অক্ষরের একটা রেস্তরাঁ। বেশ সরগরম ভেতরটা। বোধহয় আজ ছুটির দিন, এমন মনে হল লখনার। রাস্তা দিয়ে একটা মিছিল চলে যাচ্ছিল—"দেড় কোটি লোক আজ অপুষ্টিতে ভুগছে। তাদের সেবায় ত্রাণ তহবিলে মুক্তহস্তে কিছু সাহায্য করুন।" লখনা পার্কে ঢুকে বেঞ্চিতে বসল কিছুক্ষণ। তারপর বাইরে এসে পার্কের কোণায় দাঁড়াল। পাশেই একটা শেড। বাস ধরতে লোক-গুলো শেডের বাইরে দাঁড়ায়, আর গোটা শেডটাই অধিকার করে আছে অবাঞ্ছিত কিছু মুখ। লখনার মনে হল আজ আর শিব নয়,

কোন দেবতা নয়, একটা মেয়েছেলের ছবি আঁকবে ফুটপাতে। এঁকে বসে থাকবে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে দাক্ষিণ্যের অপেক্ষায়। যা পড়বে,যা পাবে আজ তা দিয়ে একটা হাতকাটা তেল কি আশ্চর্য মলম কিনবে ইস্টিশনে ফিরে গিয়ে। তারপর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে, ফুলির উরুতে তখন ঘষে ঘষে আলতো লাগিয়ে দেবে।

এমনি ভাবনার ভেতর মেয়েছেলের চিন্তা মগজে থাকলেও একটা অশীতিপর বৃদ্ধকে দেখল ছাউনির ভেতর। এত দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু সাদা চুল কাঁধ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছে। পাকা ঘন দাড়ি বক্ষদেশ স্পর্শ করে আছে। গায়ের রঙ তামার মত। অযত্ন অবহেলা আর বয়সের ভারে গায়ের চামড়া শিথিল। ধ্যানমগ্ন মহাপুরুষের মত আত্মস্থ, বড় স্থবির বসে আছে। কুড়োনো হাঁড়ি, মাছের লেজ, মাংসের ছাঁট যেন তাকে পাহারা দিয়ে আছে। ফুটপাতের ওপর ইট দিয়ে ঘষা হলুদের দাগ আর এই বিচিত্র সংসারটাকে সে যেন দ্বারী হয়ে পাহারা দিয়ে আছে।

লখনার ভারি ইচ্ছা হল বুড়োটাকে আঁকে। কয়লা ঘষে ঘষে একটা মূর্তি আঁকল। আর খড়ি দিয়ে দাড়ির সাদা রঙ করল। এঁকে নিজেই খুব মুগ্ধ হল, স্তম্ভিত হল। কেমন ধ্যানস্থ হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সম্বিত ফিরে এলে দেখল, চারজন যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার আঁকা মূর্তি দেখছে। সমালোচনা করেছে। ক'জন কি যেন বলাবলি করল কিছুক্ষণ, করে, বলল, এই কী এঁকেছিস?

লখনা তাকাল।

ঋষি অরবিন্দ?

লখনা কিছু না বুঝে তাকাল। মাথা নাড়ল।

ধ্যেৎ কবিগুরু। বেটার কাঁচা হাতে আবার কি হবে। না রে?

লখনা তাতেও ঘাড় নাড়ল।

আইনস্টাইন। ঘাড়ছুঁই রুক্ষ চুল আর লম্বা জুলপির ছেলেটা এগিয়ে এল।

কিছু বলল না লখনা। হঠাৎ একটা জোরে চড় এসে পড়ল তার

বাঁদিকের চোয়ালে। পা দিয়ে মুছে দিচ্ছিল মূর্তিটা। পায়ের ধুলোয় মহাপুরুষের ছবি আঁকা, এত বড় অপমান সহ্য করব? ছেলেগুলো চলে যাচ্ছিল। তবু ঘুরে দাঁড়াল। সমাজ বিরোধী। শালা বাস্টার্ড।

লখনা কিছুই বুঝল না। শুধু এক সময় বুঝল, ওকে ছেড়ে দিয়ে সবাই চলে যাচ্ছে। এবং শেষোক্ত লোকটার দাড়ি আছে কি না তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভীষণ কথা কাটাকাটি চলছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে লখনা উঠে দাঁড়াল। তারপর বুড়োটার কাছে গিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, শালা মরনা, তুই মহাপুরুষ?

হঠাৎ চমকে উঠল লখনা। ধম্মঠাকুর? চোখে পিঁচুটি ভর্তি। ঠোঁটের ওপর মাছি বসেছে বুড়োর। ঘাড় গুঁজে এবার খুব দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়াল একটা বিরাট মানুষের লাইনের সামনে। দীর্ঘ সারি। কারা যেন ভিখারীদের খিচুড়ি বিলোচ্ছে। লাইনের মুখে কিছু সেবাসমিতির লোকজন হতবাক দাঁড়িয়ে। তাতে কিন্তু অন্যদের ভ্রূক্ষেপ নেই। মাথা ব্যথা নেই। চেটেপুটে খিচুড়ি খাচ্ছে, লোকগুলো। ঝগড়া করছে। চেঁচামেচি। গালাগাল করছে। লাইনের মুখে বসেছিল যে মেয়েলোকটা সে দুজনের খাবার নিয়েছে, তারপর কোলের মরা ছেলেটাকে ফেলে পালিয়ে গেছে।

লখনা ঘাড় তুলে একবার মরা ছেলেটাকে দেখে নিয়ে আবার ঘাড় গুঁজে হাঁটল। বেলা বেড়েছে। রোদ্দুরের তাতে জায়গায় জায়গায় পিচ গলতে শুরু করছে। হচকচিয়ে হেঁটে হাঁফাতে হাঁফাতে ব্রিজের ওপর উঠে এল সে। দেখল, ফুলি শুয়ে আছে উপুড় হয়ে। ঠিক কাঁদছে কি ঘুমিয়ে আছে বুঝতে কষ্ট হল তার। একবার মনে হল তার গায়ে মাথায় হাত বুলোয়। ডাকে। কিন্তু মা ডাকছে, ফুলি ওঠ। তবু উঠছে না ফুলি। নড়ছে না। আমরা পরগাছা ফুলি। পয়দা আমাদের চিতির কয়লা। কাঁদিস না।

ফুলির মা এবার মাথায় হাত রাখল। ননীর খাবারটা খা। লাশ পুইড়ে ঘরের পানে পা বাড়ালি চিতির দিকি তাকাতে নি। খা। মরা ভাই-এর জন্য দুঃখু করিস নি ফুলি। স্থির চোখে

ফুলির গায়ে হাত দিয়ে আছে মা। ভগমানের দিষ্টি নি। অন্দ। থাকলি আমার মাথায় বাজ পড়ত। ভুঁই দেখা হতো কম্পে।

তবু নড়ছে না ফুলি। ভ্রূক্ষেপহীন শুয়ে আছে। বুকে কাপড় নেই। দগদগে ঘা-এর দাগটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে উরুর ওপর। ভীষণ হিংস্র যেন। বাঘ-থাবার মত। এ মুহূর্তে যে কেউ পোড়া ঘাটা দেখলে ভীষণ কাপুরুষ হয়ে যাবে। ভয়ে কয়লা আর খড়িমাটি মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে দু'চোখে হাত চাপা দিল লখনা।

সম্রাট

এই দুঃসহ পৃথিবীর অপার বেদনা সঙ্গে নিয়ে আমি চলে যাব।

একটা প্রেতশিশু যেন ঘুমন্ত স্টেশনটার ওপর আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেল। অকারণ কিছু হই-চই, কিছু তরল ব্যস্ততা, থার্মোমিটারের পারার মত ওপরে উঠতে না উঠতেই নির্বিকার নিস্তব্ধতার গায়ে মাথা ঠুকে চুপ। নির্জন, নিথর নিদ্রালুতায় আবার হারিয়ে গেল এই রূপখণ্ডের আটপৌরে ফ্ল্যাগ স্টেশনটা।

এমন অসময়ে গাড়িটা আসবার নির্দেশ ছিল না টাইম টেবল্-এ। কিন্তু এল। আসেও। তাই যেন গাড়ির শব্দে অস্তিত্বহীন প্ল্যাটফরম হঠাৎ একটু বিব্রত হল। আবার তেমনি শূন্যতা খাঁ খাঁ করল। কেউ অবাক হল না।

এই নিষ্ঠুর শূন্যতার অস্তিত্ব বুকে নিয়ে প্লাটফরমের দু'পাশে দুটো কেরোসিনের প্রৌঢ় বাতি এখনো মরেনি। মুমূর্ষু আলোর গন্ধে যে প্রেতচ্ছায়া কাঁপছে তাকে ছাড়ালেই স্টেশন সংলগ্ন পাহাড়ের গায়ে গিয়ে দৃষ্টিটা আটকাবে। এ রীতি যেন বহুকাল থেকে এখানে চলে আসছে।

উত্তর-সীমান্তের ঢালাও অরণ্য পরগণা এটা। শুধু মাঝখানে আবিরের টিপের মত ছোট্ট শহর। বৌদ্ধ সভ্যতার কিছু স্মরণচিহ্ন যারা এখানে কুড়োতে আসে, এ-শহরের আতিথেয়তায় তারা খুশী হয়। আগে আরো জলুস ছিল। চন্দনকাঠের যখন ব্যবসা করে গেছে বিলেতী কোম্পানী। স্বাধীনতার পর ফিরিঙ্গীদের নাচঘর উঠে গেছে কিন্তু মিশনারীদের স্কুলের দরজাটা এখনো সমানে খোলা।

ট্রেনের শেষ শব্দে কান রেখে দাঁড়িয়েছিলাম। প্ল্যাটফরম্‌টা আবার অচেতন। আলোটা যেন ধুঁকছে। স্টেশনের চারপাশে শাল আর মহুয়ার জঙ্গলে এখন জ্যোৎস্না। পত্রালীতে শিশিরের স্বচ্ছতা।

'কী ভাবছেন?' ফেল্টক্যাপটা আরেকটু ওপরে তুলে আমার আপাদমস্তক একচোখে বারকয়েক জরিপ করে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। বললেন, 'বিজ্ঞাপনে যতই রেল কোম্পানী লিখে রাখুক, ট্রেন আর সময় কারো জন্যে দাঁড়ায় না, কিন্তু তা যদি সত্যি হবে তবে এমন অসময়ে আপনি এখানে নামবেন কেন? ভাঁববেন না, যাবেন কোথায়, রূপখণ্ডে?'

'হ্যাঁ।'

'স্বাস্থ্য ফেরাতে, না মিশ্র আর্য সভ্যতার নিদর্শন দেখতে?'

'ছুটোই লক্ষ্য।'

'ভালই।' ভদ্রলোকের ডান কাঁধে কিড্‌ ব্যাগ, বাঁদিকে ক্যামেরা আর ওয়াটার বট্‌ল। হোল্ডঅলটা নামালেন লাল কাঁকরের ওপর। বসে পড়ে বললেন, 'বড় আশ্চর্য এই ছোট্ট স্টেশনটা, না? জ্যোৎস্নায় কত বাহার দেখুন গাছের পাতাগুলোয়। ওই দেখুন বল্লা পাহাড়। ভাবছেন খুব কাছে? না। দূর আছে। বসুন না, বাস তো সেই চারটের আগে নেই।'

স্যুটকেশটা পাশে নামিয়ে আমার ছোট্ট হোল্ডঅলটার ওপর বসলাম। বললাম, 'আচ্ছা, ওই ওয়েটিংরুমটায় গেলে হয় না? কতক্ষণ আর বসবেন ঠাণ্ডায়। বেশ হিম পড়ছে তো?'

'তা পড়ছে।' ভদ্রলোক টুপিটার ওপর হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করলেন।' তারপর টুপিটাকে আবার যথাস্থানে নামিয়ে যথারীতি ভুরু ঢাকা দিয়ে বললেন, 'আসুন।'

লাল কাঁকরের ওপর টুপিসুদ্ধ বিরাট কালো ছায়াটা পড়েছে। আমি তাকে মাড়িয়ে মাড়িয়ে হাঁটছি। দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক পকেটে হাত ডোবালেন। বললেন 'কেয়ার-টেকারকে বখশিস দেওয়া এখানকার রীতি।' তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন ভদ্রলোক।

ইতিমধ্যে যারা বখশিসের কৃপায় ছাড়পত্র পেয়েছিল তাদের কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে। ছু'জন বলিষ্ঠ দেহাতী পুরুষ আরেকটা মরদ

রাজপুত দম্পতি। অগোছাল। একটা নিদারুণ ক্লান্তি মেয়েটার চোখে-মুখে ছড়িয়ে। পুরুষটা কঠিন। ওকে বুকের ভেতর জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে আছে।

ভদ্রলোক হোল্ডঅলটা রেখে তার ওপর বসলেন। টুপিটাকে ভুরুর ওপরে তুলে মেয়েটার লাবণ্যে তাকালেন। আবার যথারীতি ভুরু ঢাকা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘুম চোখে সোমত্ত মেয়েটা শিশুর মত বুকের ভেতর লেপ্টে আছে।

এ ঘরেও একটা মৃতকল্প কেরোসিনের বাতি। ছায়াচ্ছন্ন, ম্লান অন্ধকারের ওপর বোকার মত দাঁড়িয়ে। করোগেট শেডের ঘুলঘুলিতে পায়রার হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে।

ভদ্রলোক টুপিটাকে খুললেন। ব্যাকব্রাশ ঘন চুল। বুদ্ধিদীপ্ত প্রশস্ত কপাল। চুলগুলোর ওপর আলতো হাত বুলিয়ে আমাকে বললেন, 'হোল্ডঅল খুলছেন যে, ঘুমোবেন নাকি ?''

'না। অত সহজে ঘুম হয় নাকি ?'

'ঠিক বলেছেন। অত সহজে কি ঘুম হয় ? চা খাবেন ?'

'কোথায় পাবেন ?'

'ঠিক পাবেন। পয়সায় না হয় কি ! বাঘের দুধ পাবেন তা কি না চা।' দরজার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক শিস দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বখশিস নেওয়া লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল। টাকাটা হাতে দিলেন ভদ্রলোক। 'চা'।

কিড্ব্যাগের ওপর টুপিটা খুলে রেখে সিগারেট ধরালেন। এ ঘরে ছায়াটা স্থির। একরাশ ধোঁয়া সেই ছায়ার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'লোকটা খাঁটি শয়তান। ভীষণ ঘুমোয়। একটু জোরে হাওয়া বইলেই দেখবেন ঢুলছে।'

'এসব দেখছি বেশ আপনার পরিচিত। আগে এসেছেন নিশ্চয়।'

'পরিচিত ? হ্যাঁ। মুখভর্তি একরাশ ধোঁয়ার ভেতর থেকে কথাটা যেন আমার দিকে গড়িয়ে দিলেন। সব পরিচিত। এই বন,

এই জ্যোৎস্না, এই পাহাড়, পাখি এরা সব পরিচিত। না না ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন, যা ঠাণ্ডা না বাইরে?'

কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন সেই তামাটে চেহারার বলিষ্ঠ ভদ্রলোক। উন্নত সুঠাম দেহ। প্রশস্ত কপালের ওপর উজ্জ্বল ভ্রূ দুটো নির্জীব সাপের মত শুয়ে। চোখ দুটো বড় তীক্ষ্ণ। কিন্তু কিছুক্ষণ তাকালে মনে হয়, ও দুটো যেন নকল। এত স্থির যেন পাথরের।

কোটটা খুলে বেঞ্চের কোনায় ঝোলালেন ভদ্রলোক। পুলিসি জামার মত বিরাট দুটো পকেট চওড়া বুকের ওপর। জামাটা অবিন্যস্ত। প্যাণ্টের হিপ পকেটে একটা টোবাকো পাইপ যেন ঘাড় হেট করে দাঁড়িয়ে। বেঞ্চের ওপর কাৎ হয়ে শুয়ে চা-এ চুমুক দিলেন। বললেন, 'এক্সকিউস মি, আচ্ছা, বলতে পারেন, এ পৃথিবীতে পরম সুখের বস্তু কি?' মেয়েটার চোখের ওপর লুব্ধ চোখ বোলালেন ভদ্রলোক।

আমি তাকাতেই ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা, বাইরে বেশ জোরে হাওয়া বইছে, না? আপনি দেখে আসতে পারেন, না বিশ্বাস হয়, খাঁটি শয়তানটা বাইরে বসে ঠিক এখন ঢুলছে।'

আবার তাকালেন মেয়েটার চোখ দুটোয়। রাজপুত মেয়েটার ডাগর চোখ দুটো বেশ খানিক দেখে নিয়ে আমাকে বললেন, 'কই পারলেন না, বলতে পারলেন না তো, পৃথিবীতে পরম সুখের বস্তু কি?'

রাজপুত মরদ স্বামীটার ঘন নিঃশ্বাস ঘুমন্ত মেয়েটার চোখের পাতায় পড়ছে। হাঁ করে লুব্ধ চোখে ভদ্রলোক তাকালেন। একটা সিগারেট ছিঁড়ে তামাক ভরলেন টোবাকো পাইপে। বললেন, 'জানি আপনি পারবেন না। লক্ষ লোককে জিজ্ঞাসা করেছি আর আপনি? নিন, সিগারেট খান।' প্যাকেটটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। দিয়ে বললেন 'কী জানেন? ঘুম।'

ভদ্রলোক বেশ খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়ে বসে থাকলেন

অনড় বসে কি যেন ভাবলেন। চোখ খুলে বললেন, 'অবাক হচ্ছেন? কিন্তু দেখুন না, কী ভাগ্যবান পুরুষ এরা। কী সুখী দম্পতি, ওই যে—'

কম্পাসের কাঁটার মত আঙুলটা ঘুরিয়ে আমার চোখকে নির্দেশ দিলেন, 'সুখী দম্পতি—'

কী সুন্দর একটা নির্দেশ। সুখী দম্পতী। বলিষ্ঠ অতবড় রাজপুত পুরুষটা এঁকেবেঁকে কুঁকড়ে কেমন শুয়ে আছে। বলিষ্ঠ পুরুষটার মোটা হাতটা অই মহুয়া শাখার স্থূল ছায়ার মত মেয়েটার বুকের ওপর লুটোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে ওরা।

বাইরে জ্যোৎস্না। হাওয়া। পাতা কাঁপছে। মহুয়ার পাতা ঝরছে। লাল কাঁকর হিমে ভিজেছে। পাথরের চোখ অবাক তাকিয়ে মেয়েটাকে দেখছে। বড় স্থির এখন চোখ দুটো।

'আহা!' একরাশ ধোঁয়া চারিদিকে ছুঁড়ে দিয়ে অই অব্যক্ত উচ্ছ্বাসটুকু উচ্চারণ করলেন ভদ্রলোক। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেহাতী পুরুষ দুটোর দিকে তাকালেন, বললেন, 'আঃ, শুনছেন ওদের নাক ডাকার শব্দ? বলুন তো ওরা সুখী কিনা? আমি? লক্ষ প্রচেষ্টার কাছে চাকর থেকেছি। চাকর। চাকর।'

এই বোধ হয় প্রথম দরদ দিয়ে ওঁর সঙ্গে আমি কথা বললাম। 'কেন, রাত্তিরে আপনার ঘুম হয় না বুঝি?'

'না।' অকপটে জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

বাইরে জ্যোৎস্না। হাওয়া। যুবতী রাজপুত মেয়েটার রূপোলী ঘাঘরাটা ঘুমের ঘোরে হাঁটুর দিকে চলে এসেছে। ওড়নাটা খসেছে। ভদ্রলোক যেন চোখ বুজিয়ে একটু হাঁপালেন, 'ঘুম। ঘুম। স্লীপিং ইজ দ্য জয় অব নাইট। বাট ও জয়, হোয়াট এ রেচেড আই অ্যাম্...'

করোগেড শেডের ঘুলঘুলিতে পায়রা এখন চুপ। বাইরে তাকালেন ভদ্রলোক। 'বলুন ভাগ্যবান কিনা? গোল্ডেন স্লামবার কিসেস ইওর আইজ, কিন্তু আমার, বলুন আমার? অথচ কী নেই

আমার? টাকা? বুকের ওপর ঝুল পকেটে হাত ডোবালেন। রূপ? ছুটে গিয়ে বাতিটার তলায় দাঁড়ালেন। দেখছেন, আলোটা কী ম্লান?

হাঁপাতে হাঁপাতে আবার বেঞ্চে এসে বসলেন। আমার চোখে তাকালেন। ঘুমের ঘোরে একটু কাঁপলো মেয়েটা। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের চোখ দুটো ওদিকে ঘুরলো। মেয়েটি ঘুমের ঘোরে আরো একটু কাছে সরে এসেছে। মহুয়ার স্থূল ছায়ার মত যে বলিষ্ঠ হাত... বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছিল, সে ছায়াটা ভেঙে গেছে।

জোরে জোরে পাইপ-এ টান দিলেন ভদ্রলোক। নিবেছে। একটা সিগারেট তুললেন প্যাকেট থেকে। জোরে জোরে বেঞ্চের ওপর ঠুকলেন। সিগারেটটা ধরালেন, 'ও স্লিপ ইউ আর এ জেনট্‌ল কিং,—' এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন, ছেড়ে বললেন 'বিলাভেড ফ্রম পোল টু পোল। কোথায় যেন পড়েছিলুম না?

বাইরে তাকালেন ভদ্রলোক। হাওয়া। জ্যোৎস্না। হিম পড়েছে রেল ফলকে। পাহাড়টা যেন ধোঁয়ার জটলা। বেশ কিছু-ওদিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন।

পাহাড়ের ওপর চোখ রেখে পাহাড়ের মত স্তব্ধ হয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। তারপর বুকের সেই ঝুলন্ত পকেট থেকে একটা ফটো বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন, 'আমার ফটো। আপত্তি না থাকলে দেখুন না। চোখ দুটো কিন্তু ব্লেড দিয়ে উপড়ে নিয়েছি, ঘুম হয় না বলে।'

আমি তাকালাম।

'খুব অবাক হলেন না?' অত চওড়া বুকের পাঁজর ঠেলে অবলীলায় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ওয়াটার বয়টল্‌ খুলে বেশ খানিকটা জল খেলেন। যেন সমস্ত জ্বলে যাচ্ছে। একটা আগুনের প্রচণ্ড জ্বালা যেন শিরা থেকে শিরায়, রক্তে, অনুভবে ছড়িয়ে পড়েছে।

সেই অবিন্যস্ত, আগোছাল চেহারাটা আরো কেমন উদভ্রান্ত, কেমন, বিব্রত। স্থির দৃষ্টিটা বড় করুণ। নিঃশ্বাস দ্রুততর। কি

একটা অব্যক্ত, অবিশ্বাস্য যন্ত্রণা যেন চেতনাকে গ্রাস করে আছে। বেঞ্চের ওপর উপুড় হয়ে মুখ গুজে শুলেন। তারপর চিৎ হয়ে শুয়ে বললেন, 'চোখ দুটো উপড়ে ফেলেছি।'

বাইরে জ্যোৎস্না। বনমর্মর। বাইরে এসে দাঁড়ালুম। হাওয়া বইচে বাইরে। জ্যোৎস্নার জলে শাল-মহুয়ার ছায়া ভাসছে। পাহাড় চুড়োটা যুদ্ধ প্রত্যাগত অশ্বারোহী সৈনিকের মত।

বারকয়েক পাইচারী করে ফিরে এলাম। ততক্ষণে ভদ্রলোকের সেই ভাগ্যবান মানুষগুলো একে একে উঠে বসেছে। ভদ্রলোকের সুখী দম্পতি বুকে ওড়না তুলেছে।

যেন এইমাত্র অনেক ঘুম থেকে একটা ব্যস্ততা জেগেছে। তৈরী হচ্ছে সকলে। বাসের গ্যারেজে বাতি জ্বলেছে। বাইরে থেকে ঘণ্টা পিটিয়ে ভেতরের লোকগুলোকে জাগিয়ে দিচ্ছে সেই শয়তানটা। অথচ এরি মধ্যে কি আশ্চর্যভাবে ঘুমিয়ে গেছেন ভদ্রলোক। কী পরম নিশ্চিন্তে কুঁকড়ে গাঢ় ঘুমে ঢলে আছেন ভদ্রলোক। হোল্ডঅলটা বেঁধে নিয়ে বললাম, 'আপনার ফটোটা নেবেন দয়া করে।'

সাড়া নেই। পরম আত্মতৃপ্তিতে যেন বড় আশ্চর্য আরামের ঘুম। আকাশ রং বদলাচ্ছে। ধোঁয়ার জটলা এখন ফিঁকে। প্রৌঢ় বাতিটা নিবেছে কি নিবিয়ে দিয়েছে খাঁটি শয়তানটা।

বাইরে এসে বললাম, 'ছ্যাখো, এই ফটোটা ওই ভদ্রলোককে দিয়ে দিও তো।'

লোকটা হাত পেতে নিল। বলল, ও একটা আশ্চর্য লোক সাহাব। সব ছিল একদিন। শহরের আদমী ছিল। অইতো মাস্টারসাব, সব জানে, জিজ্ঞাসা করুন না। সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কী হল, হঠাৎ এই বনের ভেতর চলে এল।

ভোরের আপ ট্রেনটা এখানে দাঁড়ায় না। কিন্তু নিয়মের মুখ চেয়ে স্টেশন মাস্টারকে দাঁড়াতে হয় এই নির্জন স্টেশনটার ওপর। ভদ্রলোক আমাদের কথা শুনে বললেন, আর বলব কি, দিনে গলাভর্তি মহুয়া খেয়ে বেহুঁশ, আর রাত্তিরটা তো নিজের চোখেই দেখলেন। রোজ

ভাবে এই অরণ্য পরগণা ছেড়ে আবার লোকালয়ে গিয়ে মানুষ হবে, কিন্তু—

থামলেন মাস্টার সাব। জানেন, ওদিকে গেলেই ওই ওর রাজ্য-টুকুতে আমাকে নিয়ে যাবে। আমার চোখ থেকে স্টেশন-মাস্টার ভদ্রলোক চোখ নামিয়ে বললেন, কিন্তু পারল কই, পারল কই, ওই রাজ্যটুকু ছেড়ে যেতে?

ওদিকে গেলেই টেনে টেনে হাত ধরে সমস্ত বাগানটা আমাকে ঘোরাবে। বলবে, এর যখন ফুল ফুটবে তখন আসবেন। এর ফুলে আর ওর চোখে কোন তফাৎ নেই। আসুন, আমার হাত ধরে টেনে আবার অন্যদিকে নিয়ে যাবে। এই যে কুঁড়ি, ক্রিসেন্থিমারের। এর লাবণ্যর সবটুকু আমার জয়ন্তিকার। আসুন, আসুন, আসুন, হাত ধরে আবার নিয়ে যাবে অন্যদিকে। এটা কি জানেন তো? কারনেশন। ওর কাছে জলুসহীন। এটা? ব্ল্যাকপ্রিন্স। আমার জয়ন্তিকার যৌবনের লালিত্যে এর লাবণ্য। হৃদয়টা কিন্তু দেখাব না। চোখ বুজলেও না। তারপর ছুটে গিয়ে বাংলোর ওপর উঠে হাঁ করে ফুলগুলোকে দেখে। খপ করে আমার হাতদুটো ওর মুঠোয় ভরে নিয়ে বলবে, এ-সব কিছু ছেড়েছুড়ে সব কিছু পেছনে ফেলে এই দুঃসহ পৃথিবীর অপার বেদনা নিয়ে আমি চলে যাবো। কিন্তু—

কিন্তু, পারল কই। থামলেন স্টেশনমাস্টার।

ভাবলুম চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা, বাংলোটা কোথায় বলতে পারেন? ভাবলুম চুপি চুপি দেখে আসি, কত ঐশ্বর্য নিয়ে আজ বাংলোর চারপাশে ফুটে আছে সেই ব্ল্যাকপ্রিন্স, ক্রিসেন্থিমাম আর কারনেশন।

জয়ন্তিকা সেনের নিষ্ঠুর খেলায় যে লোকটা আজ নিঃসীম অরণ্য প্রান্তরে মৃত—যদি আজ জয়ন্তিকা মল্লিককে বোঝাতে পারতাম, দেখে এসেছি, সে লোকটা কিন্তু আজো মরেনি।

গাঁ বুড়ো

মেষপালকের দল যেই সবে মাঠে নামবে অমনি ঢোল-শোহরত। শ্যামল মাঠের ওপর বৃদ্ধ উটের মত ঘাড় উঁচু পাহাড়, আর তারই পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে পথটা ঝরনায় গিয়ে শেষ। ওরা তিন মরদ এই পথে হাঁটছিল। ঢোল পেটাচ্ছিল।

রোদ্দুর ওঠে যখন এই পথে, পাহাড়ের সবুজ যখন রোদ্দুরের রঙে ভিজে যায়, ওরা জানে তখন এই পথেই মাঠে নামবে বালকেরা। সকালের অমল আলোয় ঝরনার জল চিকচিক করবে এখন, ঝরনায় ভিড় করবে মেয়েরা। যুবকেরা এখন ফসল বুনবে, আপেলের বনে কি আঙুরের সবুজ খেতে ওরা ব্যস্ত থাকবে। আর ঠিক এখনি একরাশ সবুজ পাখির পালক মাথায় গুঁজে, জলে রোদ্দুরে পোক্ত গাঁ বুড়ো দু-হাত তুলে হাঁকবে বালিহাঁস হো-ও-ও।

হো-ও-ও। মাঠ থেকে প্রত্যুত্তর দেবে মেষপালকের দল। বুড়ো তখন নিজের সঙ্গে কথা বলবে, বড় লক্ষণযুক্ত এই বালিহাঁস বুঝলি? ওরা এলেই বুঝবি বর্ষা আসবে। তখন তৃষ্ণায় ছাতিফাটা এই মাঠ শস্যের বুকে দুধ না জমার দুঃখ, সব, সব তখন মুছে যাবে। তৃষ্ণার জল পাবে সকলে। যেন বালিহাঁসের পিছু পিছু এই পথ ধরে গাঁ বুড়ো ছোটে। বালিহাঁস হো-ও-ও।

খোলা মাঠের ওপর গাঁ বুড়োর কণ্ঠে তোলা প্রতিধ্বনি যখন মিলিয়ে যায় তখন বাঁশি বাজায় শিমুল। টিয়া'কে ডাকে। টিয়ার মা'র তাই বড় দায়। কাল টিয়াকে কান বিঁধিয়ে দিয়েছে। ভীষণ বকুনি দিয়ে মাঠ থেকে ধরে এনে বলেছে, তেরোয় পা দিলি আর কবে কান বিঁধোবি? কান ফুঁড়ে হলুদ সুতো পরিয়ে দিয়ে বলেছে, এখন সব হয়ে গেছে তোর। মাঠে যাবি না। রোদ লাগাবি না। উড়ন্ত কাচপোকা মেরে আর টিপ পরবি না। তেরোয় পা দিলি, উড়ো পেকো মারতে নেই। কারো মনে দুঃখ দিতে নেই বুঝলি?

ঢোলের আওয়াজ মিলিয়ে গেল। বুড়োর গলা। তবু শিমুলের বাঁশি থামল না দেখে কাচপোকা ধরার অছিলায় টিয়া উঠোনে নামল। রোদ্দুর দেখল। ঝুমকো লতার ফুলে হাত দিল। আঙুলে হলুদ রঙের পরাগ লাগলে তা মাথায় মুছে নিয়ে লুটোনো আঁচল বুকে তুলল। তুলে বলল, বাব্বা বাবা, বাড়িতে থাকতে দেবে না। কী দস্যি ছেলে বাব্বা, ঠিক সাপে কাটবে।

পরক্ষণেই জিভ কাটল টিয়া। ইস্। দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করল টিয়া। মাগো মা, আমার কথা শুনো না। সাপ গো সাপ, কেটো না।

শিমুল এবার গান ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঢোল-শোহরত। না গান, না বাঁশি কোনটাতেই মনোযোগ দিল না শিমুল। শিমুল তাকাল। দূর পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনা নেমেছে। এখন বর্ষা নয়, তাই ক্ষীণ স্রোতধারা বড় ম্রিয়মাণ। নাবালিকার মত ভীরু পায়ে যেন অই জলাধারে গিয়ে মিশেছে। অথচ এই জলাশয় বর্ষায় কুলপ্লাবী হয়। তখন এই প্লাবিত মাঠের মায়া ছেড়ে মেঘের দল নিয়ে ওরা পাহাড়ে ওঠে। তখন পাহাড়ের চূড়ো থেকে টিয়াদের ঘর চোখে পড়ে শিমুলের। কখনো কখনো টিয়াকে চোখে পড়ে।

অবাক হয়ে শিমুল দেখছিল প্রতিবেশীদের। ঝরনা নামা মাঠের যেখানে গোলাকার জলাশয়ের মত সেখানে কিছু মেয়ে পুরুষ দাঁড়িয়ে। পাহারাদার বসেছে কাল সন্ধ্যা থেকে। সকাল থেকে শ'খানেকবার চীৎকার করে হেঁকেছে আর ঢোল পিটিয়েছে মরদ তিনটে। "এই মাঠ রাজার, তোমাদের নয়। এই পানি রাজার কিন্তু ঝরনা তোমাদের। মাঠে এলে ক্ষতি নেই, কিন্তু মাঠের সবুজে তাকালে গর্দান যাবে। তৃষ্ণা নিয়ে ঘরে থাক ক্ষতি নেই, তৃষিত নয়ন তুলে পানিতে তাকালে মৃত্যু, মৃত্যু।"

বাঁশী শুনে টিয়া কলসী তুলেছিল কাঁকে কিন্তু নামিয়ে রাখল। কোমরে কাপড় জড়িয়ে বাড়ির বাইরে এসে দেখল রোদ্দুরে মাঠ ভরেছে। চোখ তুলে দেখল ছাতিমের ডালে চতুর ঘুঘু পাখি একটা।

চোখ বুজে টিয়া প্রথমে মুখ ভ্যাঙাল, তারপর ঢিল ছুঁড়ে উড়িয়ে দিয়ে নিজের মনেই হাসল।

ততক্ষণে ওরা ঘরে ফিরেছে। শুন্য ঘট। টিয়া বলল, ফিরলে যে, শূন্য কাঁখ, পানি কই?

নেই।

নেই? বিস্মিত হল টিয়া। অত জল, নেই? তারপর হাতের অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলল, সব বুঝি রানীর পেটে? নিজের পেটের ওপর একটা আকৃতি রচনা করে টিয়া হাসল। পেট ছু-দিনে ফুলে উঠবে। এই হবে।

হুঁ। অবাক চোখে টিয়াকে ওরা দেখলে টিয়া বলল, পেট ফেটে যাবে। রাজার ছুয়ারে মড়ক আসবে। সব আমি শুনেছি। যুদ্ধ হবে। তখন শকুন, কুকুর রাজার লাশ চিবোবে। বুঝলে? ঝাঁজাল গলায় এতগুলো কথা এক সঙ্গে বলে ফেলে টিয়া যেন হাঁফাল।

ওরা বুঝল কি বুঝল না, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে টিয়া বলল, রাজা না ফাজা, হুঁ। পাজী। বদ। ঠোঁট বেঁকিয়ে টিয়া সোজা হয়ে বলল, অত ভয় করি না। হক কথা বলব।

ভয় কিন্তু অনেকে করে না, কিন্তু তবু করতে হয়। এই মাঠ, ঝরনা এই শ্যামল সবুজ তাদের রক্তের। তাদের পূর্বপুরুষের। কুলপ্লাবী ঝরনার জলে মাঠ ডুবে যায়, কত পলি পড়ে। বিস্তীর্ণ মাঠ পলিতে ভরে গেলে টিয়া পায়ের ছাপ এঁকে এঁকে কত ছোটে তার ওপর দিয়ে। টিয়ার ছাপ ছুঁয়ে ছুঁয়ে শিমুল পেছন পেছন। গাঁ বুড়ো পালকের টুপি পরে হাঁকে, পিঁপড়ে পোকা হো—

টিয়া প্রতিধ্বনির সঙ্গে গলা মেলায়। হো-ও-ও।

শিমুল ওকে ছোঁয়। মিনতি গলায় বলে' ঘরে যা টিয়া। শিমুল আরো ঘন হয়ে দাঁড়ায়। গাঁ বুড়ো দেখছিস না বলছে?

কেন? টিয়া চোখে চোখ রাখে। হাঁকলেই বা।

ঝড় উঠবে। বান ডাকবে। আকাশ কেমন অন্ধকার দেখছিস না? পিঁপড়ে পোকা উড়েছে।

তুই ? টিয়ারও কেমন ভয় করে। হাত ধরে টিয়া। যাবি না ?

না।

তা হলে আমিও না। অভিমান গলায় টিয়া কাদার ওপর শুয়ে পড়ে।

হাত ধরে টেনে তোলে শিমুল। পিঠময় নরম কাদা। চুলের ভেতর হাত চালিয়ে খানিকটা মুছে নেয়। পিঠময় কাদার খানিকটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলে, আচ্ছা চল।

হাত ধরাধরি করে এবার ওরা ঘরে ফেরে। শিমুল পাহাড়ের অনুচ্চ চূড়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, হাওয়া ঠেকেছে। দেখছিস, বুড়ো ঠিক বলেছে।

থমকে দাঁড়ায় টিয়া। বলে তুইও গাঁ বুড়ো হয়ে যাবি একদিন।

হা হা করে গলা ছেড়ে নাটুকে হাসি হাসে শিমুল। তারপর সোহাগ গলায় বলে, তুইও তো।

না।

কেন ?

কয়েকটা চুল মুখের ভেতর পুরে দিয়ে আলতো চিবোতে চিবোতে অস্পষ্ট গলায় বলে, জানি না।

কেন না। ওর হাত ছুঁয়ে শিমুল এবার থমকে দাঁড়ায়। কেন না, বয়েস হবে না তোর ?

হলেই বা, তোর কি ? পায়ের আঙুলে কাদা তোলে টিয়া। আমার বয়েসটাই শুধু চোখে পড়ে। ঠোঁট থেকে চুলগুলো খুলে যেন হাওয়ায় ছুঁড়ে দিল। আমাকে না ?

পড়ে।

ধ্যেৎ। হাতে ছাড়িয়ে নিয়ে টিয়া আবার ছোটে।

জলের কলসী কাঁখে তুলে টিয়া বুঝল কাঠফাটা রোদ্দুরে মেঘগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। টিয়া বাড়ি ঢুকল না। রাণীর পেটের বাহার দেখিয়ে নিজের কৃতিত্বের জন্য খানিক গর্ব হয়েছিল। তেমনি গর্বভরে পা ফেলে সামনে এসে দাঁড়াল। এই শুনেছিস ?

চোখ তুলে তাকাল শিমুল। আরো কাছে এসে বলে, কী?

রাজার হুকুম?

যেন শোনেনি, চোখে মুখে এমন ভাব আনল শিমুল। কী হুকুম?

পানি পাবি না।

শিমুল খপ করে হাত ধরে টিয়ার। এই, তুই বুঝি কান বিঁধিয়েছিস?

হুঁ। তেমনি গর্বভরে টিয়া বলল।

তা সুতো কেন? শিমুল আঙুলে চাপ দিল। আয় নীল ফুলের কাঠি পরিয়ে দিই।

হাত ছাড়িয়ে নিল টিয়া। ভীষণ এ তুই। লাগবে।

অর্থপূর্ণ হাসল শিমুল। ধ্যেৎ, লাগবে না ছাই। অত বড় হয়েছিস না?

বাতাসে টিয়ার ঘাড় ছুঁই চুল উড়ছিল। কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থেকে শিমুল বলল, আর তুই বাঁশী শুনলে আসিস না কেন?

কেন? টিয়া চোখ নিচু করল এবার। কেন আসব?

শিমুলের ভয় হল। তোরা বুঝি ভিন দেশে চলে যাবি?

কী জা-নি। লম্বা উচ্চারণ করল, টিয়া।

কী অত ভয়? শিমুল গম্ভীর হল এবার। জানিস, গাঁ বুড়োকে ধরে নিয়ে গেছে। চারিদিক দেখে নিয়ে নিচু গলায় বলল, রাজার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে রে টিয়া।

ঝুঁকে পড়ে একটা মেষশাবকের পিঠের ওপর হাত রেখে নিচু হয়ে আদর করল টিয়া। তুই যাবি?

না।

কেন?

যুদ্ধ করব। গাঁ ছেড়ে কোথায় যাব? প্রথমে কপাল কুঁচকোলো, তারপর ভুরু দুটো অনেকখানি ওপরে তুলে বলল. গাঁ বুড়ো বলে গেছে, আমাদের অনেক দায়। সে বুঝবি না তুই।

রাজার কানে গেলে তোকে ধরে নিয়ে যাবে। শুনেছি বাঁশী-টাশি ভাল লাগে না রাজার। ওর হাত ধরল টিয়া।

শিমুল আকাশে তাকাল। কপট অভিমান আনল গলায়। গেলেই বা, তোর কি? এইবার চোখ ফেরাল শিমুল। ভাল হয় তোর।

হয়। শূন্য কলসী কাঁখে তুলে রোদ্দুরের ভেতর ডুবে যেতে যেতে বলল, হয় গো, হয়। খানিক দূর ছুটে গিয়ে কলসীটা নামাল কাদা লাগা ঘাসের ওপর। কাপড়টা গোছাল করে বুকে তুলল। তারপর হাঁকল, শি-মু-ল।

তাকাল শিমুল।

হয় না—আ—আ।

পল্টন জাহাজ পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে মুখ লুকিয়ে চলে গেছে কাল। অন্ধকারে চার দেওয়ালের ভেতর চর্ব্যচূষ্য খাদ্য সাজিয়ে চন্দন দিয়ে চাঁদ কপালে এঁকে হাতে গোলাপ নিয়ে দীর্ঘ দুটো বসন্ত এই প্রবাসে রাজা বসেছিল। কাল ফিরে গেছে চন্দন মুছে, গোলাপ ফেলে একটা বিরাট রক্তের তিলক এঁকে কপালের ওপর।

এই মাটির ওপর যদিও এখন বারুদের গন্ধ নেই কিন্তু পোড়া মাটির গন্ধ রক্তের গন্ধ বাতাসে সাঁতার কাটছে। আর্তনাদ, মৃত্যু, হাহাকার, ধর্ষণ, সব মিলিয়ে- একটা আশ্চর্য দৃশ্য যেন গাঁ বুড়ো চোখ বুজলেই দেখতে পায়।

তাই ঘুমুতে চায় না গাঁ বুড়ো। ক্লান্ত, অবসন্ন দেহ নিয়ে বুড়ো সারা রাত মাঠে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। নরকঙ্কালের গায়ে হাত বুলিয়ে স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর নিজের বুকে হাত রাখে গা বুড়ো। দেখ্ আমি কিন্তু বেঁচে আছি। গা বুড়ো মাথা থেকে পালকের টুপি তুলে নেয়। আকাশে তাকায়। তারা-জ্বলা আকাশ। অজস্র নক্ষত্রের নিরূপম আলো সদ্য মুক্ত মাঠের ওপর, ঝরনায়, পাহাড়ের চূড়োয় মিশে আছে। গা বুড়ো হাঁটতে হাঁটতে

আর একটা কঙ্কাল স্পর্শ করে। চুপি চুপি বলে, শুনছো, কান্না? পুত্র হয়ে মায়ের কান্না? ওদিকে দেখ ওটা শিশুর কঙ্কাল। ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে বর্শায় লুফে নিয়েছিল। ওটা চিনলে না? ধর্ষিতা রমণীর শব। ওরা জল চেয়েছিল। তৃষ্ণার জল। দেখ শত্রু কি মিত্র যার কঙ্কাল হও তুমি, দেখ, কত গলিত শব, কত রক্ত, কত কঙ্কাল।

ভোর হতে আর দেরি নেই। গাঁ বুড়ো অবসন্ন দেহ নিয়ে ঘরে ফেরে। আলপথের ওপর দিয়ে, আঙুর খেতের ভেতর দিয়ে, আপেলের বাগান পার হয়ে টিয়াদের উঠানে এসে দাঁড়াল। কেউ নেই। টিয়ার মায়ের কাতর আর্তনাদে গাঁ বুড়ো উঠোনের একপাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সেদিন। তিনটে রাজসৈন্য ওকে উলঙ্গ করে উঠানে নামাচ্ছিল তখম। তারপর আনল টিয়াকে। ওদের পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়েছিল টিয়ার মা। কালো কালো দাঁত বের করে হি হি করে হেসেছিল ওরা তিনজনে। ধর্ষণ করল বুড়োর চোখের ওপর। টিয়া কাঁদছিল। চোখে হাত চাপা দিয়ে ডুকরে কাঁদছিল। বুড়ো কাঁদতে কাঁদতে কুয়োয় ঝাঁপ দিতে গেল। আর গিয়েই অবাক।

কুয়োটা কেমন পাকা করে গেঁথে তুলেছে রাজসেনারা। রাস্তার দিকে মুখ করা তিনটে বড় বড় গর্ত। সেই গর্তের মুখে তিনটে কামানের মুখ। ভেতরে কয়েকটা হাত বাঁধা যুবতী মেয়ে।

চোখ বুজে বুড়ো মাঠের দিকে চলে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখেছে গর্তের মুখে টিয়ার রক্তাক্ত দেহটা। দু' হাঁটুর পাশ দিয়ে ডলডলে রক্ত কাপড়ের কিছুটা আর কিছুটা ধূলিকণাকে ভিজিয়েছে।

বুড়ো এখন আলপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে এ সব ভাবছিল। বুড়োর কাঁধে ঝোলান ঝোলাটায় টিয়ার সেই রক্তাক্ত কাপড়টা। কাঁধের ঝোলাটা আরো জোরে আঁকড়ে ধরে জোরে জোরে হাঁটল। বেলা বড় হচ্ছে। রোদ আবার আগের মত শ্যামল তৃণভূমি, আপেল গাছ, আঙুরের ফল স্পর্শ করেছে। বুড়ো এখন জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে সজোরে হাঁকল—শকুন, শকুন।

কেউ নেই মাঠে। প্রত্যুত্তর নিয়ে প্রতিধ্বনি বাতাসে ভাসল না দেখে বুড়ো কেমন বিমর্ষ হল। বিমর্ষ চোখ তুলে মাঠে তাকাল। কেউ নেই মাঠে। মেয়ে মরদ কেউ নেই ঝরনায়।

অথচ কতদিন দেখেছে এই মাঠের ওপর টিয়াকে। শিমুলকে। এই মাঠ থেকে কতদিন বুড়ো শুনেছে শিমুল বাঁশি বাজিয়ে টিয়াকে ডাকছে। চার হাত-পা মেষের মত করে মেষের দলের ভেতর লুকিয়ে থেকে কতদিন শুনেছে—

বাঁশী বাজাস কেন?

তোকে ডাকি।

টিয়ার আঁচলে হাওয়া এসে বেয়াদপের মত মাটিতে লুটিয়ে দিলে কাঁধে তোলে। ডাকবি না।

কেন?

মুখ ভ্যাঙায় টিয়া। মিথ্যুক। বড় হলে গাঁ ছেড়ে তুই তো শহরে চলে যাবি। আপেলের সওদা দিবি।

কখনো না। শিমুল বলে, এই মাঠ, তুই, এ সব ছেড়ে কোথায় যাব। যাব না। এই মাঠ আমার। তোর। এই মাঠে আমাদের ছেলেরা মেষ চরাবে। মেয়েরা যাবে ঝরনায়। তুই, আমি দেখব। দেখবি না?

টিয়া হাসে। যা!

গাঁ বুড়ো হাত তুলে এবার মেষের ভঙ্গি ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বলে, সব কিন্তু শুনে ফেলেছি।

শিমুল লজ্জা লজ্জা চোখ করে মাটির দিকে তাকায়। কী শুনেছ বল তো?

তবে বাঁশী বাজা, বলব।

না। টিয়া সলজ্জ চোখ তুলে আপত্তি করে।

কেন? শিমুল তাকায়।

গাঁ বুড়ো যে বলবে।

তাতে কি?

টিয়া আরো লজ্জা পায়। হাত ধরে শিমুলের। শরম লাগে।

এ সব ভাবতে গেলে গাঁ বুড়োর চোখ কেমন জ্বালা করে। চোখে হাত চাপা দিল বুড়ো। একটু জোরে জোরে এই খোলা মাঠে হাঁটলে মাথার লম্বা লম্বা পালকগুলোয় হাওয়া কাটা কেমন শিরশির শব্দ ওঠে। এই অস্থিচর্মসার দেহটা কেমন তখন কঠিন, কেমন দৃঢ় বলে মনে হয়।

ভীষণ তৃষ্ণা পেলে এখন বুড়ো ছুটতে ছুটতে ঝরনার সামনে এসে দাঁড়াল। আঁচলা ভরে জল খেল। কিন্তু জ্বালা তবু জুড়লো না। অবগাহন স্নান করতে ইচ্ছে হল বুড়োর। কেউ নেই মাঠে। সবুজের ওপর, ঝরনার ওপর মেলা রোদ্দুরের ছায়া। কোমর থেকে জীর্ণ বাস খুলল বুড়ো। কাঁধের ঝুলি নামাল। মাথা থেকে পালক খুলে সযত্নে সাজিয়ে রাখল একটা পাথরের ওপর। তারপর জলে নামল। শিশুর মত উলঙ্গ শরীরে জল ছুড়ল। সাঁতার কাটল পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে। কাঁধ-ডোবা পাথরগুলোর ওপর উঠল। শিশুর মত এ পাথর থেকে ও পাথরে গেল। শেষ পাথরের ওপর পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল। সযত্নে হেঁট হয়ে বাঁশীটা তুলল। বুড়ো বাজাতে চাইল। কিন্তু চোখের জলধারা কেমন সব রুদ্ধ করে দিচ্ছিল। না বাজিয়ে চোখের জল মুছে আবার নামল।

কতদিন দেখেছে এমনি খেলা করছে বালকেরা। জল ছুঁড়ছে। পাথর ডিঙোচ্ছে। মেঘগুলো ভরপেট জল খেয়ে নিথর দাঁড়িয়ে আছে মুখ তুলে। না মেঘ, না রোদ্দুর আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে টিয়া হয়তো জলে বুক ডুবিয়ে বকছে, এই জল দিবি না গায়। বোকার মত তাকাবি না।

দেব। শিমুল জল ছুঁড়ছে। বেশ করব তাকাব।

ভেজা বুক জলের ভেতর থেকে তুলে টিয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লোলুপ দৃষ্টি তুলে শিমুল হকচকিয়ে তাকিয়ে থেকে বলেছে, এই জলের ভেতর একটা ঘর গড়ব টিয়া। তোকে লুকিয়ে রাখব।

টিয়া আবার বুক ডুবিয়েছে জলের ভেতর। নিজের ঘরে রাখতে

পারবি না তাই বল। টিয়া এবার ডুব দিয়েছে। জলের ভেতর নিশ্বাস ছেড়ে জলের ভেতর বুড়বুড়ি তুলছে। কিছুক্ষণ পরে মাথা তুলে বলেছে চোর কোথাকার।

যাবি আমার ঘরে ?

তোর মুরদ বড় আমার জানা আছে। তারপর উদাস গলায় বলেছে, এই ঝরনা যেখান থেকে এসেছে, আমাকে দেখাতে নিয়ে যাবি একদিন ?

যাবি ? শিমুল ছোট্ট ভিজে কাপড়ে লেপ্টে থাকা শরীর দেখতে দেখতে হাত ধরেছে, চল।

বুড়োর কেমন আনন্দ হয়েছে তখন। চারণকবিদের মত পাহাড়ের ওপর উঠে গান গেয়েছে আর নিজের ছায়া দেখেছে ঝরনার জলে। এই সবুজ মাঠের গান, তৃষ্ণার জল তার গান, রূপবতী ঝরনার গান, সে ত্রিকালদর্শী তার গান। এক সময় গান থামিয়ে চুপিচুপি ঢুকে গেছে বনের ভেতর।

গাঁ বুড়োর এখন নতুন করে সব মনে পড়ল। ঝরনা, মাঠের সবুজ, রোদ্দুর, পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে সবুজের মেলা, আপেল বাগান, আঙুরের খেত আর এই বাঁশীটা। শুকনো পাথরের ওপর ছু' ফোঁটা চোখের জল পড়তেই নিজে হাতে জল তুলে তা মুছে দিল। দিয়ে বাঁশীটা হাতে নিয়ে আবার উঠে এল। ভিজে শরীরের ওপর নিজের জীর্ণ বাস পরল। মাথায় পালক তুলল, ঝোলাটা কাঁধে নিল।

নিয়ে দেখল, ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ বিজয় পতাকা হাতে নিয়ে ছুটছে। উৎসবে যোগ দিতে। শ্বেত আর রক্তবর্ণ পতাকা। মুখে গৌরবের হাসি, বিজয়ের চিহ্ন। রক্তের ছোপ লাগা টিয়ার কাপড়টা বের করলো বুড়ো। সযত্নে চার ভাঁজ করে বাঁশীতে বাঁধল ছুটো প্রান্তভাগ। তারপর ওদের সঙ্গে বিজয় মিছিলে মিশে যাবে বলে শীর্ণ হাতে উৎসবের পতাকা নিয়ে ঝরনার জলে নিজের ছায়া দেখল গাঁ বুড়ো।

পরমপুরুষ এবং স্বপ্নের রেলগাড়ি

এই আমাদের পরিচিত ঘর। আমাদের পরিচিত বাড়ি। মনে পড়ে, ঘর থেকে বেরোলেই বিরাট দাওয়া ছিল। আর দাওয়া থেকে মাটিতে পা বাড়ালেই সেই বিরাট উঠোন, যার ওপর বার্ধক্যে অর্জুন গাছের স্থবির ছায়া মধ্যাহ্ন পার হলেই ঝুলে থাকত। আমাদের বাড়ি পাকা ছিল না। খড়ের ছাউনি ছিল। অর্জুন গাছের ছায়া মাড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরোলেই বকুল গাছ। যে বকুল কোনদিন ফুল দিল না। বকুলের চোখের ওপর ছায়াবৃত কুয়োতলা। ওই কুয়োর ভেতর আমার মা ডুবে মরেছিল।

আমার চোখ তখন শিশুর মত ছিল। অনেকদিন মা'র কোলে বসে তখন চাঁদ দেখেছি। "কেন আকাশ ছুঁতে পারি না"—বায়না করেছি। কেন বর্ষা ফুরোলে সোনা ব্যাঙের গলা ধরে, শরৎ এলেই কেন শিউলি ফুটে ওঠে—এই নিয়ে মাকে খুব বিরক্ত করেছি। তখন কে জানত, যে-বকুল কোনদিন ফুল দিল না, তার চোখের ওপর যে ছায়াবৃত কুয়োতলা, ওখানে আমার মা ডুবে মরবে?

আমাদের গাঁ-এর নামে স্টেশন ছিল। জংশন স্টেশন থেকে জল নিয়ে রেলগাড়ি যখন চলে যেত আমাদেব গাঁ ছুঁয়ে, তখন তার কাল ধোঁয়া ওই অর্জুন গাছের মাথা ডিঙিয়ে ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে যেত। কোথায় যায়? অনেকদিন ভেবেছি।

মা বলত স্বর্গে। আমার বাবাও অমনি স্বর্গে গেছেন।

আমি তাকাতাম অর্জুন গাছের মাথায়। একটু আগেও ভাসতে ভাসতে, যে রাশি রাশি কাল জমাট ধোঁয়া অর্জুন গাছের মাথা ডিঙোচ্ছিল, ওদের আর চোখে পড়ত না। বলতাম, কেমন করে গেল।

মা তাকাতেন। ওই স্থবির ছায়া ডিঙিয়ে বকুল গাছের পাশ

দিয়ে, কুয়োতলার ওপর দিয়ে মা'র দৃষ্টি অনেকদূর প্রসারিত হত। কুয়োর পরে মাঠ, মাঠে গঙ্গাফড়িং। তার ডাক পার হয়ে অবিরাম শূন্য। সেই শূন্য পার হয়ে দিগন্ত, মা-এর দৃষ্টি এই দিগন্ত শেষে চুপি চুপি এসে থামত মেঘের তলায়, রেল লাইন-এর ওপর। আমি মা'কে জড়িয়ে ধরতাম। শুনতে চাইতাম।

মা'র শূন্য দৃষ্টি আমার শিশু চোখ স্পর্শ করত। মা বলত, ওই রেলে চড়ে।

রেলে চড়ে? খুব অবাক হতাম আমি। আমিও যাব বড় হয়ে।

মা আমাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরত। একেবারে জাপটে ধরত বুকের সঙ্গে। বলতে নেই।

আমি মা'র বুকের ভেতর অবাধ্য হতাম। বারে, বাবাকে বুঝি খুঁজে আনব না?

আমাকে জড়িয়ে নিয়ে মা চুপ করে থাকত। খুব কী যেন ভাবত। আমি বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে কেমন একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেতাম। মা'র দৃষ্টি আমাব শিশু চোখ স্পর্শ করত। সেই মা আমাকে ছেড়ে কুয়োতে গিয়ে ডুবে মারল। মা স্বর্গে চলে গেল।

আমাদের গাঁ-এর নামে স্টেশন। সেই স্টেশন থেকে অনেক ধোঁয়া ছেড়ে বাঁদিকে গাড়ি ঘুরে গেলে যে শুষ্ক রাঙা নদীর ওপর লাল রেল পুল, তার ওপর ইঞ্জিনের কাল কাল চাকাগুলো উঠলেই কেমন একটা বীভৎস আওয়াজ হত। সেই আওয়াজের খুব কাছেই আমার পিসিমার কাছে পড়ে রইলাম। আমার পৃথিবী নিয়ে আমাকে ছেড়ে মা চলে গেল।

সেই শব্দের খুব কাছে যে পিসিমার বাড়ি তিনি আমাকে খুব নজরে রাখতেন। তিনি চোখ রাঙিয়ে আমাকে প্রথম দিন শিখিয়ে দিয়েছিলেন, যেন না আমি রেল দেখি। যে রেলে আমার বাবা পিসিমার বাড়ি যাবার নামে কাটা পড়েছিলেন। যেন আমি কোন-দিন কুয়োর কথা মুখে না আনি, যে কুয়োয় আমার মা ডুবে মরেছে।

অথচ আমি পিসিমার আঁচলে আমার আঙুল জড়াতে জড়াতে জিজ্ঞাসা করেছি অনেকদিন, আচ্ছা পিসি, বাবা ত স্বর্গে গেছে, না?

হ্যাঁ।

মা?

নরকে। মা নরকে গেছে। পাতালে।

আমি চুপ করে থাকতাম। ভাবতাম। অবাক হয়ে ভাবতাম। পিসিমা গম্ভীর হয়ে আমার আঙুল তাঁর আঁচল থেকে ছাড়িয়ে নিতেন।

ভাবতে ভাবতে আমার খুব রাগ হত। মা'র ওপর। কখনও পিসিমার ওপর। কখনও ভাবতাম, আর কখনও রেল দেখব না। কুয়োর নাম কোনদিন মুখে আনব না। বাবা স্বর্গে যায় যাক। মা নরকে। আমি পিসিমার কাছে বড় হব। মানুষ হব। আমার এই পৃথিবীতে অনেকদিন আমি বেঁচে থাকব।

আমার জন্মের সময় যে কানী বোস্টুমি দাই হয়েছিল, সে আমাকে মা নরকে গেলে বুঝিয়েছিল, বাবার সুনাম হারাবার খুব ভয় ছিল। কতবার পিসিমার মুখে শুনেছি, বাবা অশেষ গুণসম্পন্ন শক্তিধর পুরুষ ছিলেন। আমি যেন বাবার গুণে বড় হই।

বাবা শিক্ষাপর্বের শেষ ধাপে পৌঁছেছিলেন। শহরে নামী চাকরি করতেন। দামী পোশাক পরতেন। সমাজের নামী নারী-পুরুষের সঙ্গে গলাগলি ছিল। গাঁয়ের সঙ্গে দলাদলি ছিল। মায়ের জন্যে। বাড়ি ফিরতেন খুব কম। মায়ের জন্যেই। পিসিমা আশা করতেন আমি যেন বাবার গুণে বড় হই।

অনেকদিন পরে, যখন ওই রেল পুল মেরামতি হল, যখন সেই শুষ্ক নদীর ওপর জীর্ণ হলেও জোয়ার এল, তখন একদিন, লাল পুল পার হয়ে চুপি চুপি আমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, আমাদের খড়ের চাল বাতাসে উড়েছে। কুয়োর জল কাল-বোশেখীর জলে আরো কাল। ভূমিসাৎ রান্নাঘরের পাশে কিছু অবৈধ মানকচু গাছ বর্ষা পেয়ে ফুলেছে ফেঁপেছে। আঢ্যিদের আম গাছটায় অনেক কাঁচামিঠে আম ধরেছে।

একটা আমের অসহায় চেহারা অবশ্যই আমাকে মনে করিয়ে দিল, এবার বর্ষায় অনেক শিল কুড়িয়েছিলাম।

অবশেষে পিসিমা মারা গেলেন বসন্তে, শীতকাল যখন শেষ হয়ে এল। পরের মাসে বসন্ত এল। আমি তখন সতেরো বসন্তে পা দিলাম। আর সেই বসন্তেই আর কিছু না ভেবে ট্রেনে উঠে বসলাম। আমি শহরে যেতে চাইলাম। লোকালয়ে। বাবার গুণে বড় হতে। অবসন্ন চোখ, বিষণ্ণ মন, আর ক্লান্ত দেহ এরা সবাই মিলে গাড়ির ভেতর আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল। —এই ট্রেনেই আমার বাবাকে দেখলাম। মাকে। পিসিমা, আরো, আরো কত মুখ—আমার দেখা গোটা যেন একটা পৃথিবীকে।

আরো বড় হয়ে এই স্বপ্নের কথা অনেক ভেবেছিলাম। আরো অনেক অনেক বই পড়েছিলাম। আমার প্রিয় অধ্যাপক বন্ধুদের ঘরে ডেকে আলোচনা করেছিলাম। বিস্তর বই এনে জড়ো করেছিলাম ঘরে। কিন্তু কোথাও, কেন সেই রেলগাড়িতে একটা গোটা পৃথিবী দেখলাম, তার উত্তর খুঁজে পেলাম না। একে একে এই রেলের ভেতর মা'কে দেখলাম, বাবাকে দেখলাম, পিসিমা, আরো আরো কত যেন পরিচিত মুখ। এই বয়ঃকালে সেই স্বপ্নের কথা ভাবলে মনে হয়, আমি যেন সেই ক্লাসঘরে সেই বৃদ্ধ নাবিকের গল্প পড়ছি, যিনি যাত্রা করলেন অকূল সমুদ্রে, সুন্দর আবহাওয়ায় গির্জার তলদেশ থেকে।

স্বপ্ন দেখলাম, যে স্টেশন থেকে আমি রেলগাড়িতে চড়ে বসলাম, সে আমার গাঁ-এর নামে নয়। সেই অদ্ভুত গাড়িটা বিরাট এই পৃথিবীটাকে পেটের ভেতর পুরে নিয়ে হরদম ছুটছে। ছুটতে ছুটতে অনেক নদী, সাগর, উপত্যকা পার হল। মাঠে মাঠে যারা শস্য তুলছিল, তারা অবাক হল। মরুভূমির ওপর দিয়ে যারা উটে চেপে যাচ্ছিল, তারা আপসোস করল। উপত্যকার ওপর সোনালী রোদ ঝলমল করছিল। সেই উপত্যকা পার হয়ে ঝরনা পড়ল। সেই ঝরনার জলে তাকিয়ে তিনটি মেয়ে দুঃখের গান গাইছিল।

আমাদের রেলগাড়ি তাদের তুলে নিল না। সে গানের ভাষা আমি বুঝলাম না। কিন্তু সেই সুর আমার হৃদয়কে স্পর্শ করল। তাদের দুঃখের গান আমাকে তৃপ্তি দিল। রেলগাড়ি সামনে এগিয়ে যাচ্ছিল। বন, পাহাড়, উপত্যকা পেছনে সরে যাচ্ছিল। স্বর্গ বা নরকে নয়, এ-ট্রেন আমাদের নিয়ে পুণ্য তীর্থে চলেছিল। নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে হল। আমার চোখের ওপর যারা বসে, তাদের চোখ পুণ্য লোভাতুর। আমার খুব গর্ব হল। অপরের জন্য করুণা হল। আমি, আমরা সবাই মিলে কোন্ সুদূর পবিত্র তীর্থের দিকে এগিয়ে চলেছি।

আমি অবাক হয়ে এসব দেখছিলাম। হাঁ করে লোকগুলোর চোখে তাকাচ্ছিলাম। নানারকমের সাজবেশে নানারকমের লোক বসে আছে। নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন, সুন্দর-কুৎসিত। কখন বাইরে তাকিয়ে পাহাড়, দেখছিলাম। ঝরনা, লাল পাথর, মরুভূমি। ইঞ্জিনের মুখোমুখি বিরাট চাঁদ উঠছিল।

আমাদের গাড়ি তীর্থের খুব কাছে এসে হঠাৎ থেমে গেল। সেই নিরন্ধ্র রাত্রে ইঞ্জিনের মুখোমুখি যে চাঁদ উঠছিল, তার ধবল আলোয় সব সাদা দেখাচ্ছিল। সে আলোয় আমরা পরস্পরের মুখ খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু সবাই খুব দুঃখ পাচ্ছিলাম, তীর্থের খুব কাছে এসে গাড়ি বিকল হয়ে গেল বলে।

যিনি ইঞ্জিন চালাচ্ছিলেন তাঁকে মহাপুরুষ বলে অপরাপর যাত্রীরা খুব প্রশংসা করছিল। তাঁর হাতে কমণ্ডলু ছিল। তিনি মোটা দুগাছি দড়ির কৌপীন পরেছিলেন। বিরাট জটাজুটবিলম্বিত সন্ন্যাসী পুরুষটা তীর্থের দিকে বেমালুম ট্রেনটাকে ইচ্ছামত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পুণ্যের লোভে সবাই এই মহাতপস্বীকে খুব কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছিল, কারণ এঁর সুবিদিত সানুগ্রহ আমাদের পবিত্র তীর্থে নিয়ে যাচ্ছিল।

সাধক পুরুষ হঠাৎ ইঞ্জিন ছেড়ে দুঃখ নিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁর দড়ির কৌপীন, ভস্মাচ্ছাদিত দেহ, চন্দনলেখা ও জটাজাল আমাকে আকর্ষণ করল। তিনি বিফলতার দুঃখ জানিয়ে যাবার সময় আমাকে

ইঞ্জিনের ভেতর নিয়ে গেলেন। তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন, তোর মাকে একবার দেখবি?

মাকে? সাধুর মহা তপস্যা আমাকে বিস্মিত করল। না।

কেন? সাধুপুরুষ অবাক হলেন।

মা স্বর্গে গেছে। মা এই তীর্থের অনেক দূরে চলে গেছে।

সন্ন্যাসী হাসলেন। তারপর আমার হাত ধরে একটা কামরায় নিয়ে এলেন।

হাসি পেল আমার। আমার মা'র সঙ্গে যার কোন মিল নেই, এমন একজন যুবতীকে আমি দেখলাম। সামনে একজন যুবক যেন বহুক্ষণ থেকে বসে আছে।

এবার সাধক আমাকে নিয়ে এলেন অন্য কামরায়। সেই মেয়েটির মুখের সঙ্গে আমার মা-এর মুখের আদল অনেকখানি মিলে গেল। চোখ মিলে গেল। আমার মাকে আমি চিনলাম। বাবার সঙ্গে মা মুখোমুখি বসেছিল। ঠিক প্রথম কামরায় দেখা সেই শয়তানের মুখের মত একটা ছায়া বাবার পেছনে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মার চোখ সব সময় বাবাকে পাহারা দিচ্ছিল।

ভাবলাম মাকে ডাকি। কিন্তু সেই মহাসন্ন্যাসী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার জিভ আড়ষ্ট করে দিলেন। কী আশ্চর্য, আমি এখন চিত্রার্পিতের মত অতীতকে দেখলাম। বাবা আর যখন ফিরল না, তখন সেই শয়তানটা আমাদের কুশল নিতে এল। মা হেসে কথা বললেন। মা আমাকে কোল থেকে নামিয়ে বাইরে রেল দেখতে পাঠিয়ে দিলেন। আমি অর্জুন গাছের ছায়া ডিঙিয়ে বাইরে এলাম। বকুল গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেল দেখলাম।—এর পর মা খুব বমি করত দেখতাম!

সাধুর কৃপায় আমি অতীত দেখলাম। আমার জিভ জমে গিয়ে বরফ কুচির মত অসাড় মনে হল। সন্ন্যাসী আমার হাত ধরে অন্য কামরায় নিয়ে এলেন। এখানে আমার অবিবাহিতা পিসিমাকে দেখলাম। তিনি অন্ধকারে আপন-মনে আত্মনিগ্রহে মগ্ন। কত কি

যে কল্পনা করে তিনি কত রকম করছেন। কখনও কারো ওপর তীব্র রাগ দেখাচ্ছেন। যেন কারোর পীড়ন থেকে নিজেকে লজ্জায় মুক্ত করতে চাইছেন। কখনও তাঁর চোখে, মুখাবয়বে হর্ষ পুলকানন্দের আলো ছায়া জ্বলে উঠছে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। একা অন্ধকার ঘরে পড়ে পিসিমা একলাটি আপনমনে এসব করছেন।

কেন জানি, সন্ন্যাসীকে এবার আমার খুব ভয় করছিল। তিনি এবার চোখের ইশারায় আমাকে ইঞ্জিনের ভেতর নিয়ে এলেন। সেই মহাতপস্বী এবার আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কী দেখলি ?

আমার জিভের আড়ষ্টতা ঘুচিয়ে আমি স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারলাম, আমার মাকে, পিসিমাকে—

না। সন্ন্যাসী আমার চোখে তাকালেন। দেখলি পৃথিবীর রূপকে। নারীদেহের প্রবৃত্তিকে।

বললেন, এরপর তোকে আমি পুরুষদের ঘরে নিয়ে যাব চল। সাধুপুরুষ গাড়ির ভেতর থেকে আকাশে তাকিয়ে চাঁদ দেখলেন। গোলাকার চাঁদটার শঙ্খসাদা আলোয় এই বন, পাহাড়, এই ঝরনা আর লালপাথর খুব সাদা দেখাচ্ছিল। সাধুপুরুষ আমাকে বললেন, তোর বাবাকে দেখ।

না, ও আমার বাবা নয়। বাবার চোখ অত নিষ্ঠুর ছিল না।

সাধুপুরুষ হাসলেন যে, লোকটাকে সাধুপুরুষ আমার বাবা বলে পরিচয় দিলেন আমি অবাক হয়ে তাঁর চোখ দেখলাম। লোকটা একটা সুন্দর মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে যেন একটা হোটেল ঘরে দুজনে বসে হরদম মদ গিলছিল। মেয়েটির চোখে কোন যন্ত্রণা ছিল না। সে ঠিক মত, যেন স্ত্রীর মত নিখুঁত প্রেম করছিল। মেয়েটি চুলগুলোকে ঘাড়ের ওপর সাজিয়েছে। ওর জামার দামী কাপড় নিশ্চয়ই কোন লম্পট দরজি চুরি করেছিল। ওর বক্ষ খুব সুডৌল এবং ওইটুকু জামার ভেতর শোভন করে সাজিয়ে রাখতে পারছিল না। কিন্তু তবু ওর সামাজিক ভদ্রতা দরজির ওপর খুশীই ছিল। ওর

জামার পিঠের দিকটা এমনভাবে কাটা ছিল, যাতে ওর পিঠের ওপরটা ঠিক চাঁদের মত দেখাচ্ছিল।

তোর বাবাকে চিনলি? সাধুপুরুষ আমার চোখে তাকালেন।

না। ও আমার বাবা নয়। বাবার চোখ সরল ছিল। তুমি জাননা বাবা কত ভাল ছিল। কানী দাই আমাকে বলেছিল, বাবার সুনাম হারাবার খুব ভয় ছিল। আমি পিসিমার কথা বলতে চাইলাম। বাবা অশেষ গুণসম্পন্ন শক্তিধর পূর্ণপুরুষ ছিলেন। তিনি চাইতেন আমি যেন পিতার গুণে বড় হই।

যে লোকটাকে বাবা বলে পরিচয় দিচ্ছিল, সে লোকটা হরদম মদ গিলছিল। মেয়েটির দামী আঁচল খসে খসে পড়ছিল। ঘাড় ঘুড়িয়ে কখনও কখনও সে আকাশ দেখছিল। লোকটি তার ঘাড়ের ওপর চাঁদ দেখছিল। কখনও মেয়েটির সাদা আঙুলগুলো খুব জোরে চেপে চেপে ধরছিল। মেয়েটি এমন ভাব করছিল, যেন কষ্টের চাইতে লজ্জা বেশী পাচ্ছিল। ভদ্রলোক নেশার ঘোরে অনেক প্রাণের কথা বলছিল! —"এ পৃথিবীর সঙ্গে পশুর যোগ শুধু প্রজনন আর মৃত্যুর। কিন্তু মানুষের সঙ্গে? মানুষের সঙ্গে কি তাই? মানুষ যেমন পৃথিবীর কাছ থেকে নেয় তেমনি দিতেও হয় পৃথিবীকে। দিতে হয় কল্যাণ কামনা, শুভ চেতনা, প্রগাঢ় ভালবাসা।" —এসব নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে বলছিল। শুনে সাধুপুরুষ আমার চোখে তাকালেন। তাঁর ভস্মাচ্ছাদিত দেহ, দড়ির কৌপীন, জটাজাল ও চন্দনলেখা দেখালেন। বললেন, চিনলি?

আমি অবাক হয়ে তাকালাম। কিছুক্ষণ স্তব্ধ, হতবাক দাঁড়িয়ে থেকে চীৎকার করে ডাকলাম, বাবা তুমি?

বাবার চোখ রং-চটা তাসের মত দেখাচ্ছিল। মেয়েটি চিৎকার করে বলে উঠল, তুমি পিতা?

না। বাবা সেই চোখে আমার চোখে তাকালেন। সে দৃষ্টি ঝাপসা সন্ধ্যার মত। না, আমার কেউ নেই, আমার কেউ নেই। আমি

পিতা নই। বাবার চোখ আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। ঈগলের চোখের মত।

বাবা তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ ?

হয়ত নেশার ঘোরেই, কিন্তু কেঁদে ফেললেন। কী এত পাপ করেছি, যে এই নরকেও আমার শান্তি নেই।

ঘুম আমার ভেঙ্গে গেল। ট্রেন চলছিল হু হু করে। উঠে বসে দেখলাম, সবুজ ধান ক্ষেত এখনো সূর্যের আলো না পেয়ে অস্পষ্ট। তবু হলুদ পাখি, হলদে প্রজাপতি, সব যেন বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। উঠে দেখলাম, আমরা সবাই আমাদের গন্তব্যে চলেছি। নারী আর পুরুষ। এই দুই শ্রেণীর জীব আমরা চলেছি লোকালয়ে। শহরে। তীর্থে। স্কুল মাস্টার, কেরানী, কৃপণ, মামলাবাজ, শিল্পী, ছাত্র। প্রথম আর তৃতীয় শ্রেণী মিলিয়ে কিছু ধনী আর নির্ধন। কিছু সুন্দর আর কুৎসিত। কিছু ভক্ত আর বেকার, কিছু চাটুকার এবং লম্পট।

এই পৃথিবীর লোকগুলো, যারা এখন এ মুহূর্তে আমার চোখের সামনে বসে, তাদের চোখে তাকিয়ে মনে হল ঠিক যেন স্বপ্নের রেল-গাড়িতে এদের দেখেছি আগে।

ক্রীতদাস

আর, সেই বোধহয় প্রথম ভালবাসার পাত্র-পাত্রীদের ওপর প্রথম আমার করুণা হয়েছিল। লোকটা আমার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতেই আমি তো অবাক। সান্ত্বনাব সুর এসেছিল গলায়। লোকটাকে সাহস দিয়েছি আমি। বুঝিয়েছি, ছিঃ, কেঁদ না। তুমি না পুরুষ মানুষ?

অথচ সে লোকটাই। স্টেশন পার হয়ে লেভেল ক্রসিং-এর মুখেই চোখাচোখি। বিস্ময়ে চীৎকার করেছি, আরে, সুব্রত না?

সুব্রত চোখ কুঁচকেছে। ওপরের ঠোঁট দিয়ে নিচের ঠোঁটটা খানিক কামড়ে ধরে কী যেন ভেবেছে। তারপর, অবাক হয়েই উচ্চারণ করেছে, রুনু না?

এখানে?

ও আবার হাসল। বারে, এখানে ওমনি নাকি? এমন পাণ্ডব-বর্জিত দেশে নিরুদ্দেশে থাকবার মত পাত্র আমি নই। শ্বশুরবাড়ির দেশ এটা। আমি বিয়ে করেছি রুনু। হাত তুলে লাল রেল কোয়ার্টারে তাকাল। তারপর কোন আগ্রহ প্রকাশ না করেই বলল, কত যায়, কত আসে, কে কাকে চিনে রাখে বলো? রেলের চাকরী, কত যে এমনি দেখা হয়ে যায়? সোজা হয়ে দাঁড়াল সুব্রত। তুমি বুঝি এই ট্রেনেই নামলে?

হ্যাঁ।

এখানে তোমার কে থাকেন?

আমার দেশ এটা। জন্মভূমি। আমি উত্তর দিয়েছি।

আজো ঠিক তেমনি আছে সুব্রত। কথা বললে ঠোঁট কামড়ায়। চোখ নাচায়। গলা ছেড়ে একটা নাটুকে হাসি হাসতে হাসতে হঠাৎ-ই গম্ভীর হয়ে যায় একসময়। সুব্রত কোন আগ্রহ প্রকাশ না করে যাবার জন্যে পা বাড়াল। যেতে যেতে আবার থমকাল। হাসল

তেমনি। কথার স্বর আর হাসির শব্দে লোকটা যেন কোথায় আলাদা। একটা লোকের ভেতর দুটো সত্তা চুপচাপ পাশাপাশি জেগে আছে। হাসে একজন। কথা বলে অন্য কেউ। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, একদিন দাঁড়িও স্টেশনে এসে। দেখবে কত আসছে, কত যাচ্ছে। কে কার হিসেব রাখে বল? হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হল সুব্রত। তারপর চলে গেল।

সুব্রত চলে গেলে আবার নতুন করে সব মনে পড়ল। এই লোকটাকে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কী আশ্চর্য করুণাটাই না সেদিন করেছিলাম। সেই তিনটি বছর পেছনে অফিসের আমরা ক'জন কনফারেন্সে বসেছি। সবচেয়ে পেছনের সীটে বসে মাথা নিচু করে ফুলে ফুলে কাঁদছিল লোকটা। নিতান্ত তাচ্ছিল্যে ফিরেও তাকাইনি আমরা ক'জন। একে একে সব চলে গেলে চুপি চুপি আমার কাছে এসে হাতদুটো খপ করে ধরে ফেলে নিজের হাতে তুলে নিয়ে আমার চোখের ভেতর কী যেন আবিষ্কার করে বলেছিল, পারি না, আর পারি না রুনু। বুক আমার জ্বলে।

চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল ওর বলিষ্ঠ বুকের ওপর। মিস সেনকে তোমরা বুঝিয়েছ, আমি লম্পট, হিংস্র, অমানুষ। একটা অসুস্থ মনের লোক আমি। নির্জন ঘরটার ভেতর আমার চোখের ওপর দাঁড়িয়ে অসহায়ভাবে কাঁদছিল। বল না, তোমাদের কী লাভ হল তাতে?

লাভ? কী বলছ তুমি সুব্রত? এ তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার সুব্রত। আমাকে তুমি জড়িও না। আমাকে তুমি দায়ী ক'র না। এসব আমি জানিই না কিছু।

শোননি?

অত আমার সময় কোথায় বল? তোমার মিস সেনের কোন সুধীজন আমি নই। কিছু শুনিনি আমি।

তোমরা কেউ আমায় দেখতে পার না। কেউ একটা প্রাণ খুলে কথা পর্যন্ত বল না। কিন্তু তুমি তেমন নও। সুব্রত চোখের জল

মুছছিল না। তুমি বড় ভাল। ঠোঁট কামড়াচ্ছিল ও। পারি না আর পারি না রুনু। বড় নিঃস্ব। তুমি কিন্তু আমায় ঘৃণা ক'র না।

লোকটা কদমতলার পাশ দিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেলে আমি আমার পথ ধরলাম। রাঙাদি বলেছিল, চল না, ঘুরে আসি। সবাই যাচ্ছি আমরা রুনু। তোর ছুটি তো এখন।

হ্যাঁ।

রাঙাদি অন্তরঙ্গ গলায় বুঝিয়েছিল, হাজার হোক জন্মভূমি তো? না হয় দেখেই এলি গ্রামটাকে একবার। সেই রঙিন ফুলের চত্বর, গাছগাছালি, ঘাস ফুল আর গঙ্গা ফড়িং, একেবারে যা তুই চাস। একটু ইতস্ততঃ করে বলেছিল, লীলারাও আছে এখনো। যতবার চিঠি লেখে তোর কথা জিজ্ঞাসা করে।

জামাইবাবু আগেই চলে এসেছিল। সঙ্গে লটবহর আর হরেক-রকম টুকিটাকি। সেই সঙ্গে জামাইবাবুর হাফডজন বন্ধুর ভেতর আমি বোধহয় হাঁফিয়ে উঠব বলে বলেছিলাম, তোমরা যাও, দুদিন পরে ঠিক দেখো হাজির হয়েছি আমি। জামাইবাবু বলেছিল, যাস কিন্তু রুনু। স্টেশনে থাকতে পারি।

শরৎ সবে ফুরিয়ে যেতে বসেছে এখন। গাছের পাতা ঝরে ঝরে এরি মধ্যে কেউ পত্ররিক্ত, কেউ এখনো বেশ সজীব হয়েই দাঁড়িয়ে আছে। পড়ন্ত বেলার রোদ তাদের গায়ে লেগে বেশ উজ্জ্বল কেউ কেউ। কচি পাতার ওপর থেকে এখন পড়ন্ত রোদের ছায়া শুকিয়ে যাচ্ছিল। মাঠ ফাঁকা। দুটি কিশোর আমার আগে আগে হাঁটছিল। আমাকে দেখছিল মুখ ফিরিয়ে। হয়ত নতুন মুখ মনে করে ওরা কী সব বলাবলি করছিল। এমন পড়ন্ত বেলায় এই স্টেশন চত্বরে কত এসেছি আগে। কিন্তু সে প্রায় এক যুগ আগে। এখন কত বদলেছে। মাঠের পাশ দিয়ে পিচের রাস্তা চলে গেছে বালিখাল পর্যন্ত। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে শুকনো বালিখালের ওপর বাঁশের সাঁকো নেই আর। কাঠের পুল পার হয়ে ইট-খোলার পাশ দিয়ে আমার সেই জন্মভূমির পথ ধরলাম। এই সাঁকোর ওপর কত উঠেছি আগে। আমি আর

লীলাদি। কত ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি। টেলিতারের সোঁ সোঁ শব্দ শুনেছি। কেবিন ঘরের পাশ দিয়ে কতদিন হেঁটে যেতে যেতে লীলাদিকে বলেছি, তোকে নিয়ে রেল গাড়িতে চড়ে বসে সবচেয়ে সুন্দর নামের একটা স্টেশনে গিয়ে নামব লীলাদি।

লীলাদি তাকিয়েছে। লাইনের দিকে চুপচাপ অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছে, আচ্ছা তুই, আমাকে লীলা বলতে পারিস না?

ধ্যেৎ। তুমি না বড় সাতদিনের। বলতে নেই।

আছে।

নেই।

না। দিদি বলবি না। লীলাদি না। তাহলে আমি তোর সঙ্গে রেলে চড়ব না। লীলা বলবি। চড়ব তাহলে।

বলব। সিগন্যাল পোস্ট থেকে কান সরিয়ে বলেছি।

মাথা নীচু করেছে লীলাদি। মাঠে মাঠে শীতপাখির ঝাঁক। উড়ন্ত পাখির ছায়া খুঁজতাম আমরা। খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হলে লীলাদি বলত, আমাকে নাম ধরে না ডাকলে উড়ন্ত পাখির ছায়া তোর চোখে পড়বে না।

ডাকব।

আমাদের গ্রামের নামে স্টেশনের নাম হল না বলে আমি বেজায় দুঃখ পেতাম ছোটবেলায়। তখন এই দক্ষিণের বারান্দায় সকলের চোখ থেকে সরে এসে ভাবতুম। এই দক্ষিণের বারান্দায় আজ একটু আগেও রোদ ছিল। সেই রোদের ওপর আমি এখন বসেছিলাম। বসে বসে ভাবছিলাম। সেই ভাবনার ভেতর কখন লীলাদি এসে দাঁড়িয়েছিল আমি লক্ষই করিনি। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, কী অত ভাবছ সেই কখন থেকে বসে বসে।

ও তুমি? আমার ভাবনার সুতো হঠাৎ ছিঁড়ে গেলে, লীলাদির চোখে তাকিয়েছি। অভিযোগের সুর এনে গলায় বলেছি, এতদিনে বুঝি সময় হল?

লীলাদি খুব প্রাণখোলা হাসি হেসে বলল, বারে একথা বুঝি আমি বলতে পারি না? সময় আমার অঢেল। লীলাদি অন্তরঙ্গ গলায় বলল, এসেছ বেড়াতে, আমাদের সঙ্গে দেখা করতে তো আর নয়। জন্মভূমি দেখতে। তাই আসিনি। ঠোঁটের ওপর থেকে হাসির রেখা মুছে দিয়ে বলল, পাছে যন্ত্রণা পাও, তাই।

, আমার দীর্ঘশ্বাস চুপি চুপি বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছি। কপট অভিমান গলার ভেতর জমিয়ে রেখে বলেছি, তোমাকে তো কবেই ভুলে গেছি।

লীলাদি তাকাল না। কোন কথা বলল না।

এই দক্ষিণের বারান্দা থেকে ট্রেন লাইন চোখে পড়ে। কালভার্ট পার হয়ে ট্রেনটা ডিসট্যান্ট সিগন্যালের পাশ দিয়ে ঘুরে গেলে ইঞ্জিনের আলোয় অংশত এ বাড়িটা এবং এই দক্ষিণের বারান্দার সবটা হঠাৎ আলোকিত হয়ে ওঠে। সে আলোয় কত গল্প করেছি আগে। আলো পড়বার আগেই কতদিন আমি আর লীলাদি দূরত্ব বজায় রেখে তাড়াতাড়ি ছাড়াছাড়ি হয়ে সরে বসেছি।

লীলাদি আমার পাশে বসল। বলল, তুমি খুব বদলে গেছ রুনু।

আমি এবার তাকিয়েছি। লীলাদির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। মুছে নিয়ে বলল, একদিন তো যেতে পারলে না। তোমাদের তো এমন কোন আত্মীয় আমি নই, সম্পর্ক তো প্রতিবেশীর।

আমার গলা কেমন বুজে আসছিল। বলেছি, তোমার সামনে গিয়ে দাঁড়াব সে মুখ আমার নেই। তুমি আমায় ক্ষমা কর লীলাদি। ধ্যেৎ, খুব পেছনের দিকে যাচ্ছ তুমি। খুব স্বাভাবিক গলায় যেন লীলাদি কথা বলতে চাইল। তুমি দুঃখ কর না। লীলাদি উঠল।

সন্ধ্যা খুব গাঢ় হয়ে নামেনি এখনো। লীলাদি হাত ছাড়িয়ে নিল। উঠি। ওঁর আবার ডিউটি আছে রাত্তিরে।

লীলাদি চলে গেলে সন্ধ্যাটা যেন খুব ঘন হয়ে চোখের ওপর ফুটল। চাতাল, চিলেকোটা, কামিনী গাছের পাতায় জ্যোৎস্নার

শাদা আলো পড়ে খুব স্পষ্ট সব আমার চোখের ওপর ভাসছিল। লীলাদি চলে গেলে সব কেমন ওলটপালট হয়ে গিয়ে একটা ধাঁধায় যেন পরিণত হচ্ছিল আমার চোখের ওপর।

লীলাদি আবার ফিরে এল। কী এখনো বসে যে?

তুমি ফিরলে যে?

অই যে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলাম, তাই।

কী?

কবে যাচ্ছ?

আজই।

আজই?

হ্যাঁ, রাত্তির ট্রেনে। ভোরে পৌঁছব। সকালে অফিস।

ছুটি শেষ?

শেষ।

এলে যখন, আরো কিছুদিন থেকে গেলে পারতে। রাঙাদিরা তো থাকছেন কিছুদিন। জল হাওয়া এখন ভাল, স্বাস্থ্যটা না হয় একটু ফিরিয়ে নিয়ে গেলে।

এখন আমি চুপচাপ বসে থাকলে লীলাদি বলল, আবার কবে আসছ? আঁচলের প্রান্তভাগ আঙুলে জড়ালো লীলাদি।

দেখি।

এলে তো একযুগ পরে। এবার? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লীলাদি। এস।

তুমি এখন বিবাহিতা লীলাদি। পেছনের দিনগুলোকে চোখের ওপর তুলে এনে লাভ কি বল? তোমার স্বামী আছেন ঘরে।

একটা নাটুকে হাসিতে ফেটে পড়ল লীলাদি। বাব্বা। কথা শিখেছ বটে? আগে শুধু লীলাদির শরীর থেকে সুখ নেবার বেলায় যত বুদ্ধি যোগাত ঘটে।

এই প্রথম আমি নাম ধরে ডেকেছি। বলেছি, তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি লীলা। আমার পাপের জন্য তুমি আমাকে শাস্তি দাও।

আমার গলার স্বর বুজে আসছিল। ধরা গলায় বলেছি, তুমি খুব অসুখী লীলা, রাঙাদির মুখে শুনেছি। লীলা একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে দ্রুত চলে গেল।

উঠলাম। আমি রাত্তিরের ট্রেনে ফিরব বলে রাঙাদি সব কিছু তৈরী করে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে খাইয়ে দাইয়ে ইটখোলার বাঁক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বলল, সঙ্গে কেউ রইল না। সেই কোন রাত্তিরে ট্রেন, অনেকদিনের অচেনা, সাবধানে যাস রুনু।

বাঁক পার হয়ে এগোলাম। সাঁকো এখন নেই বলে আবার দুঃখ হল আমার। পুলের ওপর উঠতেই চোখাচোখি।

লীলা হাসল। খুব উচ্ছল গলায় বলল, কি চিনতে পারছ না? ভূতটুত নই কিন্তু! লীলা।

এত রাত্তিরে?

ধ্যাৎ। রাত্তির না ছাই। তোমার কাছে গাঁ আজ অচেনা। তাই। সবে তো দশটা। সব কিছু তাই অবাক লাগছে তোমার।

জ্যোৎস্নায় সব শাদা। ওর চোখ, চুল, ভুরু এবং গলার নিচেটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। ও আবার হাত ধরল আমার। দুঃখ কেউ চায় না বলে কত লোক সুখের আশায় গাঁ ছেড়ে চলে গেল। আবার হাসল। খুব ভয় পেয়েছিলে না?

না।

চল মাঠে নামি। আমার হাত ধরে টানল লীলা।

পুল পার হয়ে এখন আমরা স্টেশনের পথ ধরে হাঁটছিলাম। দু'ধারে মাঠ। লীলা বলল, চল নামি।

কেন?

কেন আবার। লীলা হাসল। সেই আগের দিনে ফিরে যাব বলে।

আকাশের দিকে দেখল লীলা। অফুরন্ত জ্যোৎস্নায় আকাশ শাদা। লীলা বলল, তেমনি সিগন্যাল পোষ্টে কান পাতবে তুমি, সেই যেমন পাততে। শব্দ শুনবে'খন। দেখবে সব তোমার মনে

পড়বে। লীলা থমকে দাঁড়াল। ছোটবেলার সব শব্দ তোমার কানে গেলে আমি তৃপ্তি পাব।

লীলা হাত ধরে টানলে বোকার মত লীলার সঙ্গে রাস্তা ছেড়ে মাঠে নামলাম। রাস্তার পাশে বন্ধ্যা বিস্তৃত প্রান্তর। বাবলা আর কিছু অন্য জাতের মাথা উঁচু গাছ মাঠের মাঝে মাঝে প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। রুক্ষ ঘাসগুলো এখন ভিজে ভিজে। লীলা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছিলাম, কই, তাতো জিজ্ঞাসা করলে না ?

কোথায় ? আমি অস্পষ্ট গলায় জিজ্ঞাসা করেছি।

স্টেশনে।

স্টেশনে ? কেন ? অবাক গলায় প্রশ্ন করেছি আমি।

তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাব বলে। তারপর হেঁয়ালি করে হেসে বলল, না গো না, আমার স্বামী আমার জন্য অপেক্ষা করে বসে আছেন। তোমার ট্রেন, রাতের শেষ গাড়ি। তোমাকে নিয়ে চলে গেলে তবে দুজনে ফিরব।

সে তো দেরী অনেক।

স্টেশনে এতক্ষণ আমরা জ্যোৎস্নায় গল্প করব। লীলাদি এবার ম্লান হাসল।

হ্যাঁ গো। লীলা আবার লম্বা করে উচ্চারণ করল। যে অফিসে আমার স্বামী আগে চাকরি করতেন সেই অফিসের গল্প। লীলা এখন আর হাঁটল না। বলল উনি গল্প করবেন অফিসের। পুরনো দিনের। ভালবাসার।

ভালবাসার ?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তেমনি দোলায়িত উচ্চারণ করল আবার।

রাত এখন অল্প নয়। মাঠের পূবদিগন্তে দু'একটা আলো। দূরে। আলেয়ার মত। হয়ত খেত-খামার চৌকি দিচ্ছে কেউ কেউ। কিংবা বালিখালে জাল নামিয়ে বসে আছে হয়ত।

তারপর এখন কি হবে জানো ?

কি ? লীলার প্রশ্নে এতক্ষণ পরে আমি কথা বলেছি।

তোমার ট্রেন আসবে। মানে রাতের শেষ গাড়ি এখন চলে যাবে। উনি ডিউটিতে ব্যস্ত থাকবেন। সিগন্যাল দেবেন। লাইন ক্লীয়াব দেবেন আলো ফেলে। তারপর ?

সব ফাঁকা তারপর। ইস্টিশানের কুলিটি হিন্দী গান গাইতে গাইতে ঘরে ফিরবে। ভেণ্ডারের আলো নিবে যাবে। সব কেমন চুপ, কেমন ফাঁকা আর শূন্যের মত এই স্টেশনটা সকালের অপেক্ষায় পড়ে থাকবে।

আমার কোন জবাবের প্রতীক্ষা না করে লীলা বলল, চল চল, বাত পাখীর ছায়া খুঁজি চল।

আমি লীলার হাত ধরে গাছের দিকে তাকালাম। চোখে পড়বে ?

নাইবা পড়ল। তুমি আমি পাশাপাশি হাঁটছি, আগের মত এত-দিন পরে হাঁটছি, এটাইতো সব।

এই বাত্তিরে ক্রীতদাসের মত ওর পিছু পিছু হাঁটলাম। বললাম, মড়ার যেমন জাত নেই, তেমনি ক্রীতদাসের কোন জুড়ি নেই লীলা। দেখ না, কত সহজে, আমি কেমন ক্রীতদাস হয়ে গেছি ?

ও কথায় লীলার কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। দেখ—

কী ?

এ জায়গায় একটা বাঁশ পোতা ছিল আগে। মনে পড়ে ? বাঁশেব মাথায় হাঁড়ি মাথায় কাকতাড়ুয়া ?

পড়ে।

মাঝে মাঝে একটা নীলচে গোছের পাখি এসে বসত না ?

হ্যাঁ।

তুমি কাকতাড়ুয়াকে ভেঙাতে। পাখিটাকে লাফিয়ে লাফিয়ে তাড়াতে। উঠতে চাইত না। না ?

তাই।

একবার তেমনি করে ভেঙাও না ?

আমি অবলীলায় মুখ বিকৃতি করে ভেঙালাম।

লীলা হাঁটতে হাঁটতে বলল, এখানে ছিল একটা উঁচু ঢিপি। ওপরে উঠে তুমি লম্বা না আমি, তা মাপতাম। বল, মাপতাম না?

হুঁ।

এখন এস দেখি। লীলা দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এস মাপি।

আমি মাপলাম।

সামনে আবার এগোলো লীলা। দেখ? ও হাত ধরল আমার। ঠিক ওখানটায় গাছটার ওপরে শঙ্খচিল উড়ত ঘুরে ঘুরে। তুমি ঘুরতে কে ছুঁতে পারে আগে। আমিও।

ঠিক মনে আছে তোমার।

ছায়া ধরবার জন্য লীলা কোমরে আঁচল জড়াল। তারপর ঠিক সেই আগের মত অবলীলায় ঘুরতে লাগল।

প্রিয়জনোচিত

স্টেথস্কোপটা বুকে লাগিয়ে হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিলেন অনুপম ডাক্তার কিন্তু কম্পাউণ্ডার হিরণ্ময় মহাপাত্রের উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলেন। যার জ্বালা যেন মুহূর্তেই পঙ্গু করে দিল অনুপম ডাক্তারের বক্তব্যটুকু। দু'কান থেকে পেতলের চিক্‌চিক্‌ হাতল দুটো দু'হাতে নামিয়ে গলায় ফাঁস লাগালেন। তারপর চিবিয়ে চিবিয়ে যেন ঠিক গালের ভেতর মার্বেল ঢুকিয়ে উচ্চারণ করলেন, না, সম্পূর্ণ সুস্থ আপনি।

অনুপম ডাক্তারের চোখদুটো কেমন ছোট হল। ভুরু দুটোকে ঠেলে ঠেলে অনেকখানি ওপরে তুললেন। কপালের ওপর ভাঁজ ফেলে ওপরের ঠোঁট দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন। যেন একটু জোরেই কামড়ালেন। ফ্যাসফেঁসে গলায় দ্বিতীয় কোন অকারণ উত্তরের আগেই কম্পাউণ্ডার হিরণ্ময় মহাপাত্র ওদিক থেকে উত্তর দিয়ে উঠেছে অমনি: আজ্ঞে হ্যাঁ।

অনুপম ডাক্তার অনেকক্ষণ অনড় বসে থাকলেন চেয়ারে। গলার ফাঁস খুলে সজোরে অথচ সন্তর্পণে স্টেথস্কোপটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর উঁকি মেরে বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে সামনে বাঁধা ঘোড়াটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

এই নিয়ম, জেলা শহরের এই নিয়মটুকু সেই যুগ যুগ ধরে বয়ে চলেছে এই শহরটার ওপর দিয়ে। ঘোড়াটা যখন প্রথম এ শহরে পদার্পণ করে তখন ছিল অনাদি ডাক্তার। নাম ছিল খুব। দাপট ছিল বিস্তর। ঘোড়াটাও তখন মরদ ছিল। তারপর সময়ের টানা-পোড়নে কত বদলে গেছে এ শহরটা। জুম্মা মসজিদের রং চটে গেছে। দক্ষিণ খোলা মিউনিসিপ্যাল অফিস ঘরের মোগলাই কার্নিশের কারু-

কাজ খসে গেছে। শ্মশানঘাটের সাদা দেওয়ালগুলো কয়লা দিয়ে মৃত ব্যক্তির নাম লিখে লিখে কয়লা-কালো হয়ে গেছে। তবু নিয়মের এতটুকু রদবদল ঘটেনি এই জেলা শহরে।

তাই সকালে উঠে সেই অনাদি ডাক্তারের মত এই অনুপম ডাক্তারকেও চলতি নিয়ম ধারায় পা মিলিয়ে জেলা শহর দাতব্য চিকিৎসালয়ে বসতে হয় ঘণ্টাখানেক। তারপর উত্তর দিকের অমসৃণ কুমীর-পীঠ সড়কে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে সোজা মাঠ ভেঙে শ্মশানঘাটের দিকে ঘোড়া ছোটানো। রাত্তিরের শবযাত্রীরা জড়ো হয়ে চুপচাপ সারা রাত্তির বসে থাকে মহাশ্মশানে। ঘোড়া থেকে নেমে সেই অনাদি ডাক্তারের মত আদি রং হারিয়ে ফেলা বিবর্ণ হ্যাটটাকে মাথা থেকে নামিয়ে বগলে চাপেন অনুপম ডাক্তার। তারপর স্ক্যাভেঞ্জারের হাত থেকে 'লিস্টি' নিয়ে ফ্যাসফোঁসে গলায় তাচ্ছিল্যে অস্পষ্ট উচ্চারণ করেন—এক নম্বর—

হাজির বাবু। মহাশ্মশানের বুকে পুণ্যালোভাতুর মহাযাত্রীর দল হাতজোড় করে অনুপম ডাক্তারের সামনে ছুটে এসে দাঁড়ায়। হ্যাটে চাপ দিয়ে দাঁত খিঁচোন অনুপম ডাক্তার। হাজির বাবু? মোলো কিসে?

স্তব্ধ, নিশ্চুপ শ্মশান প্রান্তর। বড় করুণ কিছু দীর্ঘশ্বাস, দগ্ধ, বড় নিদারুণ হাহাকার প্রতি প্রভাতের এই নির্মল হাওয়ায় যেন ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ওরা চুপি চুপি। সমস্ত শ্মশানটা যেন হাঁ করে হকচকিয়ে মহানেত্রে তাদের চোখে চেয়ে আছে। আর সেই চোখের সঙ্গে এই যাত্রীগুলোর চোখোচোখি হতেই কেউ চোখ বুজিয়ে ফেলে, কেউ খুলে শুধু জল মোছে।

পাষাণ অনুপম ডাক্তারের নির্মম কণ্ঠটা আবার গর্জে ওঠে। কিসে মোলো?

কিছুক্ষণের জন্যে কোন সাড়া শব্দ নেই। কম্পহাতে শবের মালিক অনুপম ডাক্তারের উপরি পাওনাটুকু অনুপম ডাক্তারের হাতে গুঁজে দেয়। নিউমোনিয়া।

অনুপম ডাক্তারের ঘোলাটে চোখদুটো অন্তত তখনকার জন্যে চকচক করে ওঠে। পাপ ঢুকলো।

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে শবযাত্রীরা। স্তব্ধ, বড় স্তব্ধ এই শ্মশানটা যেন হাঁ করে চেয়ে আছে এদের চোখোচোখি। কোন প্রতিবাদ নেই। তিনটে তো মোটে চুল্লী। সকলে জানে, এ নিয়ে অনুপম ডাক্তারের সঙ্গে তর্ক করলে অনুপম ডাক্তার হ্যাটে চাপ দিয়ে ওমনি শোনাবে— একটায় অনুপম ডাক্তারের মুখ পুড়বে, একটায় তার সুনাম পুড়বে, আরেকটায় যে তার পক্ষীরাজ গো? ছ'ইঞ্চি চ্যাটালো কপালের নীচে জন্তুর মত তীব্র আর তীক্ষ্ণ চোখ দুটো জ্বলবে তখন অনুপম ডাক্তারের দগ্‌দগ্‌ করে।

অথচ—

ঘোড়াটার বাঁধন খুলে একটা চাপড় মেরে ঘোড়াটাকে একটু আদর করলেন অনুপম ডাক্তার। অথচ—

ঘোড়াটার বাঁধন খুলে সামনে দাঁড়ালেই সেই ভাবনার সুতোয় হঠাৎ টান পড়ে। আর তখুনি এক লাফে ঘোড়াটায় চেপে বসেন অনুপম ডাক্তার। ভাবতে ভাবতে কুমীর-পিঠ অমসৃণ সড়কটুকু শেষ করে ধুধু-মাঠে সজোরে ঘোড়া ছোটান অনুপম ডাক্তার। অনুপম ডাক্তারের চোখের ওপর সুন্দর ছিল নাকি আগের দিনগুলো?

অনুপম ডাক্তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই শবযাত্রীরা মড়ার গায়ের ঢাকা খুলে দিত। অনুপম ডাক্তার দেখতেন কি দেখতেন না। শুধু একবার নিজের হাতখানা পকেটটাকে স্পর্শ করে ফিরে আসত। বিবর্ণ হ্যাটটা বগলে চেপে গম্ভীর গলায় আদেশ দিতেন, জ্বালিয়ে দাও।

অথচ—

ভাবতে ভাবতে ধুধু-মাঠে ঘোড়া ছোটালেন অনুপম ডাক্তার। অথচ অই হিরণ্ময়। অই হিরণ্ময় মহাপাত্র। ভাবতে ভাবতে খানিকটা ঘাম কপাল থেকে চেঁচে নিয়ে মাঠে ঝরিয়ে দিলেন। সেদিনও তো এই অনুপম ডাক্তার অবসন্ন দেহটা দুলিয়ে দুলিয়ে চুল্লীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ঘোড়া থেকে নেমে সেদিনও এই অনুপম ডাক্তারের

নির্দয় হৃদয়টা মোটা টাকার লোভে আদেশ দিয়ে উঠেছিল নাকি, জ্বালিয়ে দাও ?

ঘোড়া ছুটছে টগবগিয়ে। ধুধু প্রান্তরের ওপর ক্ষুরের খটাখট শব্দ যেন বরফের মত গলে যাচ্ছে। সজোরে চাবুক লাগালেন ঘোড়ার পিঠে শ্মশান ডাক্তার অনুপম। যেন আরো জোরে, আরো ঊর্ধ্বশ্বাসে আরো আরো কোথাও, অন্য কোন দূর বেনামী বন্দরে উধাও হয়ে যেতে চাইছেন অনুপম শ্মশান ডাক্তার।

লাশটাকে শ্মশান ডাক্তার সেদিন ভাল করে দেখেছিল কি ? ঘোড়ার পিঠে আরেকটা চাবুক লাগিয়ে আবার আজ নতুন করে ভাবতে চেষ্টা কবলেন অনুপম ডাক্তার।

ঘোড়া ছুটছে টগবগিয়ে। একরাশ খটাখট তীক্ষ্ণ শব্দ যেন তাড়া করেছে পেছনে পেছনে। ধুলোর গন্ধে, মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে পেছনে পেছনে। লাশটাকে সেদিন ভাল করে দেখেছিল কি শ্মশান ডাক্তার ?

অনুপম ডাক্তারের লোভী হাতদুটো চোখ দুটোকে অন্ধ করে দিয়েছিল সেদিন। সেই অন্ধ চোখে পলকমাত্র দেখেছিল শ্মশান ডাক্তার, লাশটা একটা যুবতী মেয়ের। পাছে গ্রামের মধ্যে ঢিঢি পড়ে যায় তাই লজ্জায় নিজে থেকে বিষ খেয়েছিল মেয়েটি।

কী মেয়ে গো ! অনুপম ডাক্তারের বিস্ফারিত চোখদুটো মেয়েটার শেষ যন্ত্রণাকাতর চোখদুটোয় অপলক তাকিয়ে উচ্চারণ করে উঠেছিল। তারপর লোভী চোখদুটোয় মৃত্যুশীতল মেয়েটার যৌবনে অনেকক্ষণ অপলক তাকিয়ে নিজের হাতে গায়ের সমস্ত ঢাকা খুলে দিয়েছেন শ্মশান ডাক্তার। নিরাবরণ করেছিলেন মেয়েটাকে।

দেখে কাঠ হয়ে গেছেন অনুপম ডাক্তার। নখ থেকে চুল পর্যন্ত বহুবার নগ্ন দেহটার ওপর ওঠানামা করেছে অকারণে অন্তহীন লোভী দৃষ্টিটা। নিজে হাতে লাশটা নেড়েছেন ! পরীক্ষার ছলে বহুবার বৃথাই ছুঁয়েছেন যৌনাঙ্গগুলো। মনে মনে উচ্চারণ করেছেন শ্মশান ডাক্তার, 'ইস্ ! যে কাঁচা বয়সের ছুঁড়ী !'

ধরা গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন শ্মশান ডাক্তার—একাজ করলো কে? আর সঙ্গে সঙ্গে টাকার হাঁচি শুনতে পেয়েছেন শ্মশান ডাক্তার।

কোথায় যেন ওত পেতে বসেছিল এই হিরণ্ময় মহাপাত্র। ঠিক তখুনি ছুটে এসে খপ করে হাত দুটোকে জড়িয়ে ধরে সাজোরে মুচড়ে দিয়েছে হিরণ্ময় মহাপাত্র। বেইমান, তোকেই জ্বালিয়ে দেব এখুনি।

মাঠ ভাঙতে ভাঙতে ঘোড়াটা যেন হাঁফাচ্ছে। সেই সঙ্গে অনুপম ডাক্তারও যেন ককটু হাঁপালেন।

প্রথম চুল্লীটা সবে তখন ধরে উঠেছিল। সে আগুনের ঝাঁক এই রোদ্দুর-জ্বলা মাঠে আজ যেন স্পষ্ট অনুভব করছেন শ্মশান ডাক্তার। —তারপর একে একে সব জড়ো হল। অপমানের শেষ রইল না অনুপম ডাক্তারের।

বেশ মনে আছে আজো অনুপম ডাক্তারের, এই ঘোড়ায় চেপে অনুপম ডাক্তার ফেরেনি সেদিন। হাতকড়া লাগিয়ে ঘুষ খাওয়ার অপরাধে পুলিসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল অনুপমকে। জীবনভোর সঞ্চয়ের শেষটুকু পর্যন্ত ঠেকো দিয়ে যখন ছাড়া পেয়েছিল তখন সন্ধে হয় হয়। শহরের হাড়ুডু খেলা উৎসাহী যুবকরা অপেক্ষা করছিল থানার সামনে। হিরণ্ময়ের গলায় সুতোবাঁধা লাল গোলাপের মালা। লাল। টকটকে লাল। আলোর মালা গলায় দিয়ে এই ঘোড়ার পিঠে হিরণ্ময় যেন ঠিক দেবতার মত বসে। আর—

একটু হাঁফালেন অনুপ ডাক্তার। জুতোর মালা গলায় দিয়ে খবরের কাগজ পরালো শহরের হাড়ুডু খেলা উৎসাহী যুবকেরা। গাধার পিঠে চাপিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে অনুপম ডাক্তারকে ঘুরিয়েছিল সারা শহরটা।

অনুপম ডাক্তার কাঠ। চোখ দুটো হিম। ছ'ইঞ্চি চওড়া কপালের নীচে গর্তে ঢোকা ঘোলাটে চোটদুটো সাহস করে যখন বার দুই খুলেছে তখন শত হাত দূরত্বের অই ঘোড়ার ল্যাজটাই খালি চোখে পড়েছে।

অনুপম ডাক্তার কাঠ। চোখ দুটো হিম। কষে ডুগডুগি বাজাচ্ছে শহরের হাড়ুডু খেলা উৎসাহী যুবকেরা। দু'ইঞ্চি চওড়া কপালের ওপর একরাশ কড়ির মত শাদা দুঃখ যেন চকচক করছে। যেন ঘোলাটে চোখদুটোয় দাউ দাউ করে রক্তিম চিতা জ্বলছে।

এত অপমানিত হয়েও তবুও ঘৃণা করেননি অনুপম ডাক্তার। শরমে সম্ভ্রমে বরং শ্রদ্ধা করেছেন শ্মশান ডাক্তার। দূর থেকে শত ধিক্কারে তবু নীরব অঞ্জলি ছুঁড়ে দিয়েছেন। —আহা, হিরণ্ময় মহাপাত্র শুধু মহান নয়, সুমহান, সুমহান।

আর সেই থেকেই কেমন যেন ভয় ভয় করে অনুপম ডাক্তারের। তাই কেমন যেন বদলে গেছেন আজ অনুপম ডাক্তার। সুস্থ ব্যক্তিকে মিথ্যে অসুস্থ সাজিয়ে বহু ভুয়ো টাকা কামিয়ে নিয়েছেন অনুপম ডাক্তার। সেই ঘটনার পর থেকে তাই শ্মশান ডাক্তার রোগীকে স্পর্শ করলেই হাতের সমস্ত কাজের সঙ্গে আড়ি করে দিয়ে হিরণ্ময় মহাপাত্র চুপচাপ অপেক্ষা করে। শ্মশান ডাক্তার সত্য-মিথ্যে নিয়ে লোফালুফি করেন অনেকক্ষণ। তারপর মিথ্যেটাকে পেটের দিকে চালান করে দিয়ে সত্যটাকেই ঠোঁটের দিকে ঠেলে দেন শেষ পর্যন্ত।

মাঠ শেষ করে অনুপম ডাক্তারের ঘোড়া শ্মশানঘাটের সামনে এসে দাঁড়ালো। শ্মশান ডাক্তার একবার তাকালেন। দেওয়ালগুলোয় অজস্র নাম। কালো কয়লার অজস্র আঁচড়। অনুপম ডাক্তার অন্যমনস্কভাবে আর একবার তাকালেন। সে মেয়েটার কেউ কি নাম লিখেছিল সেদিন? কেউ? অন্ধচোখে যে মৃত মেয়েটাকে অযথা চটকেছিলেন এই মহাশ্মশানে?

ঘোড়াটাকে সামনের একটা দেবদারুর ডালে বাঁধলেন। তারপর শ্মশান চুল্লীর দিকে হাঁটতে হাঁটতে আরো একবার তাকালেন দেয়ালে দেয়ালে।

ইতিমধ্যে তিনটি শব জড়ো হয়েছে। ছড়ানো ছিটানো শবযাত্রীরা একে একে নীরবে অনুপম ডাক্তারের সামনে এসে দাঁড়ালো। শ্মশান ডাক্তার স্পষ্টই উচ্চারণ করলেন, একনম্বর—

শ্মশান ডাক্তারের ইশারায় শবের গায়ের ঢাকা খুলে দিল। বসন্ত। সেই থেকে নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করেন শ্মশান ডাক্তার। সারা শরীর ভরে অসংখ্য গুটি। অনুপম ডাক্তার চোখ বুজিয়ে বললেন, এক নম্বর চুল্লী।

, দ্বিতীয়জন সামনে এসে দাঁড়ালো। সারারাত্তিরের ক্লান্তি, কি একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণা আরেক আশ্চর্য মানুষে রূপান্তরিত করেছে লোকটাকে। চোখের জল মুছে নীরবে ঢাকাটা খুলে দিল লোকটা।

আহা রে, মারা গেল ?

বছর তিনেকের একটা ফুটফুটে বাচ্চা। অনুপম ডাক্তার চোখ বুজিয়ে ফেললেন। আহা রে।

তৃতীয়জন সামনে এসে ককিয়ে কেঁদে উঠলো। অনুপম ডাক্তার নিজের চোখদুটো একটু বুজিয়ে বললেন, কাঁদিসনে, চুপ কর। ভাল করে মড়াটা পরীক্ষা করলেন অনুপম ডাক্তার। সর্পাঘাত। সারা শরীর নীল হয়ে গেছে। মুখের দু'পাশ থেকে নীলচে ফেনা গড়িয়ে গলার খাজে খানিকটা আটকে আছে।

পারে না, পারে না, পারে না অনুপম ডাক্তার। আর পারে না। আর সইতে পারে না। রোমশ বাহু দিয়ে আস্তে লোকটাকে টেনে তুলতে চাইলেন। কাঁদিসনে, চুপ কর। —ডাকরে ডাক, অই সর্ব-শক্তিমান হিরণ্ময়কে ডাক। ছলছলিয়ে উঠলো চোখ দুটো। গাঢ় নিঃশ্বাসে সূর্যের দিকে তাকালেন অনুপম ডাক্তার—

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যাস্যাপিহিতং মুখম
তৎত্বং পূষন্নপাবৃনু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।

ডাক, ডাক প্রাণভরে ডাক। সত্যকে ডাক। সব সত্য, সব আনন্দকে আড়াল করে দেখছিস না চোখের ওপর কী আশ্চর্য জ্বলছে ? প্রাণভরে ডাক। শান্তি পাবি রে, শান্তি পাবি।

আস্তে আস্তে টেনে তুললেন স্বামীকে বউটার বুকের ওপর থেকে অনুপম ডাক্তার। থুতনী আর কপালের ওপর লেগে থাকা নীল

ফেনা নিজে হাতে মুছিয়ে দিলেন। পরীক্ষা শেষ করে চোখ বুজিয়ে কোন উপায়ে উচ্চারণ করলেন, তিন নম্বর চুল্লী।

কাজ শেষ। বগল থেকে হ্যাটটা নিয়ে মাথায় চাপালেন অনুপম ডাক্তার। দেয়ালটায় আরেকবার অন্যমনস্ক তাকিয়ে ঘোড়ার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বেলা বেড়েছে। কতকগুলো শকুন কি শঙ্খচিল, ঠিক বোঝা যায় না, ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ওপর।

শ্মশানের কোলের কাছেই শহর মুখো রাস্তা। মাঠের ওপর দিয়ে বুক ঘষে ঘষে শহরে গিয়ে শেষ। বেলা বেড়েছে। সারা মাঠভরে যেন আগুনের টুকরো ছড়িয়ে পড়েছে। একটা ক্লান্তি, কি একটা উত্তেজনায় ঘোড়ার পেটে একটা জুতোর ঠোক্কর লাগালেন।

জুতোর ঠোক্করে ঘোড়টা আগে এমনি মাঠের পথে ছুটলে ঘোড়ার ক্ষুরের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান ডাক্তারের খাকি প্যান্টের পকেটটা রানারের হাতের বল্লমের ঘুঙুরের মত তালে তালে বাজতো। অথচ—অথচ আজ? কম্পাউণ্ডার হিরণ্ময় মহাপাত্রের পবিত্র দৃষ্টিটা সূর্যের মত সর্বত্র জ্বলছে।

আজ যেন অসহ্য লাগে অনুপম ডাক্তারের এই নিয়ম মাফিক বৃত্তিটা। নির্লোভ, সম্পূর্ণ সনাতন মনটা নিয়ে সকালের সঙ্গে সঙ্গে মিউনিসিপ্যাল দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাত্যহিক হাজিরে দেওয়া আর মরা মানুষগুলোকে হাতে ধরে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা। প্রাত্যহিক নিয়ম-ধারার এই বিষাক্ত গ্লানি কেমন যেন বিষিয়ে তুলেছে, অনুপ ডাক্তারের মস্তিষ্ক।

মাঠ শেষ করে শহরের রাস্তার ওপর উঠেছে ঘোড়া। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে একটা মানুষ যেন চিৎকার করে উঠলো।

চমকালেন অনুপম ডাক্তার। দুহাতে লাগাম টেনে ঘোড়ার গতিটা সংযত করলেন: আরে, অন্ধমুনি, কী খবর?

অন্ধমুনি সত্যিই অন্ধ। শহরের মুখোমুখী এই পরিত্যক্ত পোড়ো বাড়িটায় ভিক্ষাবৃত্তির সঙ্গে আত্মীয়তা পাতিয়ে বাস করে লোকটা।

সকলে বলে অন্ধমুনি। আন্দাজে ঘোড়াটার একটা পা জড়িয়ে ধরে বললো একবার নামবেন বাবু?

ঘোড়ার ওপর বসেই অনুপম ডাক্তার সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেলাটা পরীক্ষা করলেন। লোকটা একটা আন্দাজে পা জড়িয়ে ধরে বলল, অন্ধ হয়েছি অইতো আমার সম্বল বাবু। একটু আগেও আপনার ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ নিয়ে এল। একটু আগেও তো কাঁদছিল। একটু নামবেন বাবু? কার হাত ধরে আর গাঁয়ে ভিক্ষেয় বেরোবো বাবু?

অনুপম ডাক্তার ঘোড়া থেকে নামলেন। চলো! পোড়ো বাড়িটায় ঢুকলো দুজনে। অনুপম ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন অর্ধউলঙ্গ দেহটাকে। টকটকে তাজা লাল রক্ত পড়েছে চুইয়ে চুইয়ে কাপড়ময়। নিতান্ত বিমূঢ়ের মত স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকলেন অনুপম ডাক্তার। নিস্পন্দ। নির্বাক। প্রস্তর মূর্তি যেন। মাথার মধ্যে একরাশ প্রশ্ন। এলোমেলো। বিক্ষিপ্ত। অভিজ্ঞ ডাক্তার অনুপম। ছ' ইঞ্চি কপালের ওপর দগদগে মোটা শিরা দুটো দপদপ করছে। যন্ত্রণায় কালো হয়ে গেছে নিতান্ত কিশোরী মেয়েটার চোখ দুটো। তাকালেন অনুপম ডাক্তার। বার বার তাকালেন। স্ফীত তলপেটটায় বারবার কটাক্ষ করলেন অনুপম ডাক্তার।

প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে ঘোড়ায় চাপলেন শ্মশান ডাক্তার। শ্মশান ডাক্তারের যে ঘোলাটে চোখ দুটো সূর্যের দিকে তাকিয়ে এখনো বেলা ঠিক করতে পারে, সে দুটো চোখ অই সুমহান হিরণ্ময় মহাপাত্রকে তিন নম্বর আলমারির বিষ ওষুধগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সকালে ভুল দেখেনি তো? লাফ মেরে ঘোড়াটায় চেপে বসলেন অনুপম ডাক্তার।